নিবেদন

পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অত্যধিক আগ্রহে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া দিই। সময়ের অল্পতায় এবং লেখকের অযোগ্যতায় যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। তবে সতী-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি—ইহাই আমার পরম লাভ।

পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণের বঙ্গানুবাদ ও প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি আগাগোড়া একটা প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন; এবং সোদরাধিক স্নেহভাজন শ্রীমান্ নলিনী-ভূষণ গুহ সর্ব্বদা পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। কত জনের কত উপকারের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই এই নাম দুইটা ছাপার অক্ষরে লিখিয়া রাখিলাম—যদি মনে থাকে।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩১৮। } শ্রীজলধর সেন

"মনসি বচসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি ।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী ॥"

রামায়ণের সূচনা

বহুকাল পূর্ব্বে চ্যবন নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল রত্নাকর। রত্নাকর ঋষিপুত্র হইলেও লেখাপড়া শিখেন নাই। রত্নাকর যখন উপযুক্ত হইলেন, তখন সংসার-প্রতিপালনের ভার তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইল। সংসার-প্রতিপালন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন ; অর্থার্জ্জন করিতে হইলে বিদ্যাবুদ্ধি চাই। রত্নাকরের বিদ্যাও ছিল না, সুবুদ্ধিও ছিল না। তিনি অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অতি ঘৃণিত মহাপাপের পন্থা অবলম্বন করিলেন,—রত্নাকর দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গৃহের পার্শ্বেই অরণ্য ; অরণ্যের পার্শ্বেই নির্জ্জন পথ। সেই পথে যে সমস্ত লোক গমনাগমন করিত, তিনি তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেন, প্রয়োজন হইলে নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

এইভাবে কিছুদিন যায়। ব্রাহ্মণ-তনয়ের এই পাপ-কার্য্য দেখিয়া স্বর্গের দেবতাগণ ব্যথিত হইলেন ; তাঁহার উদ্ধারের জন্য দেবতাদিগের বাসনা হইল। দেবতারা

পাপীকেও ঘৃণা করেন না। একদিন ব্রহ্মা ও নারদ ছদ্মবেশে, রত্নাকর যে পথে দস্যুতা করেন, সেই পথে উপস্থিত হইলেন। সেদিন রত্নাকরের বড় অভাব ; হাতে একটি কপর্দ্দকও ছিল না। ব্রাহ্মণদ্বয়কে আগমন করিতে দেখিয়া রত্নাকর হৃষ্ট হইলেন ; ভাবিলেন, তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিলে তাঁহার সেদিন চলিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণদ্বয় একটু অগ্রসর হইলেই রত্নাকর তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং হস্তস্থিত প্রকাণ্ড যষ্টি দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাদের নিকট যাহা আছে আমাকে দেও, নতুবা এই যষ্টির আঘাতে তোমাদিগকে শমন ভবনে পাঠাইয়া সমস্ত হস্তগত করিব।" ছদ্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন, "আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; আমাদের নিকট কিছু নাই বলিলেই হয়। সামান্য অর্থের জন্য আমাদিগকে বধ করিও না।" রত্নাকর তাঁহাদের বিনীতবচনে কর্ণপাত করিলেন না ; তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন করিলেন। তখন ছদ্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন,"বাপু, বধ করিতে হয় পরে করিও। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি ; তুমি এই যে পাপ-কার্য্য কর, এ পাপের অংশী কেহ আছে ?" রত্নাকর বলিলেন "যাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহের জন্য এই কার্য্য করি, তাহারাই আমার এই পাপের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।" ব্রহ্মা বলিলেন, "কথাটা কি কোনদিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ ?" রত্নাকর বলিলেন,"না, কোন দিন জিজ্ঞাসা করি

জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করি নাই।”
…ন ব্রহ্মা বলিলেন, “আমাদিগকে বধ কর তাহাতে আপত্তি
…ই; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বাড়ীতে যাইয়া এই কথাটা একবার
…জ্ঞাসা করিয়া এস। আমরা পলায়ন করিব না।
…মার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমাদের দুই জনকে
ঐ বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে পার।” অন্য দিন হইলে
হয় ত রত্নাকর এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না; কিন্তু
দেবতার কৃপায় আজ তাঁহার একটু সুমতির সঞ্চার হইল।
তিনি ব্রাহ্মণদ্বয়কে বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে গমন
করিলেন।

রত্নাকর গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমে পিতা, পরে মাতা,
শেষে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার পাপের
অংশী কি না? সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করিলেন।
পিতা, মাতা, স্ত্রীর ভরণপোষণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।
পুত্র বা স্বামী যদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মাতা,
পিতা বা স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, তবে তাহার জন্য সেই-ই
দায়ী।

এই কথা শুনিয়া রত্নাকরের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িল। তিনি তখন অধীর হইয়া পড়িলেন; যাঁহাদের জন্য
তিনি এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার
পাপের অংশী নহেন! তাঁহার হৃদয়ে তখন অনুতাপানল
প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে

ব্রাহ্মণদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন এবং এই পাপমুক্তির উপায় কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে, একান্তচিত্ত হইয়া একাসনে বসিয়া বহুবৎসর রামনাম জপ করিলে তাঁহার পাপক্ষয় হইবে। রত্নাকর তাহাই স্বীকার করিলেন। পাপীর মুখে কি সহজে ভগবানের নাম আসে; অনেক কষ্টে রত্নাকর রামনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি একদিন, দুইদিনে হয়;—রত্নাকর একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ষাটি হাজার বৎসর রাম-নাম জপ করিলেন। তাঁহার শরীর কঙ্কালসার হইয়া গেল, শরীরের উপর বল্মীক গৃহ নির্ম্মাণ করিল; তিনি বল্মীক-স্তূপের মধ্যে সমাহিত হইয়া গেলেন।

এত কঠোর সাধনার পর তিনি দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিলেন, তাঁহার নবজীবন-প্রাপ্তি হইল। বল্মীকে দেহ আচ্ছাদিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল বাল্মীকি মুনি। ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদে, কঠোর সাধনার বলে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হইলেন। সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়, ইহা একটি মহাসত্য।

অতঃপর দেবগণ তাঁহাকে আদেশ করিলেন—

"যেই রামনাম হৈতে হইলা পবিত্র।
সেই গ্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র॥"

বাল্মীকি ভাবিয়া আকুল! এ কি আদেশ প্রভু! আমি

লেখা পড়া জানি না ; কেমন করিয়া আমি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিব। আদেশ হইল, তোমার কণ্ঠে বাণী অধিষ্ঠিতা হইবেন !

তাহার পর একদিন বাল্মীকি মুনি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক নিষাদ নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি যখন সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নির্দ্দয়-ব্যাধ-পরিত্যক্ত শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রৌঞ্চ-যুগলের একটা তাঁহার সম্মুখে পথের উপর পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া মহামুনি বাল্মীকি শিহরিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, ধনুক হস্তে লইয়া ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মুখ হইতে সহসা উচ্চারিত হইল—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"

এ কি স্বর্গীয় বাণী ! এ কি অমৃতময়ী ভাষা ! এ কি মনোহারী ছন্দঃ ! বাল্মীকি অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ হইতে এ কি অলৌকিক বাণী বহির্গত হইল ! তখন দেবতার আদেশ হইল, "এই ভাষায়, এই ছন্দে তুমি রামায়ণ রচনা কর। স্বয়ং বাণী তোমার কণ্ঠাগ্রে অবস্থিতি করিবেন।"

দেবতার আদেশে বাণীর বরপুত্র বাল্মীকি সুললিত দেবভাষায় রামায়ণ রচনা করিলেন। ইহাই রামায়ণ-রচনার ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বকালে মিথিলাদেশে এক বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। এখন যে স্থানকে ত্রিহুত জেলা বলে, সেই স্থানকেই মিথিলা বলিয়া লোকে অনুমান করিয়া থাকেন। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজার নাম নিমি। নিমির পুত্র মিথি এবং তাঁহার পুত্র জনক। অতঃপর মিথিলা দেশে যিনি যিনি রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জনক নামে অভিহিত হইতেন। তবে রাজা দশরথের সময় যিনি মিথিলায় রাজত্ব করিতেন, জনক বলিলে প্রধানতঃ তাঁহাকেই বুঝায়।

রাজা জনক আদর্শ-নরপতি ছিলেন। সেই জন্য ঋষিগণ তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিও, সত্যসত্যই এই উপাধি লাভের উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ভূপতি অতি কমই ছিল; আবার তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, যোগনিরত ও নির্লিপ্ত সংসারীও বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি এতদূর জ্ঞানী ছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণও তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের কথা মনে না করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারীতি সুসম্পন্ন করিতেছেন, অথচ সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তি-শূন্য,

বিষয়-বাসনাহীন, এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজর্ষি জনক এই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়াই তিনি লোক-সমাজে বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

সীতাদেবী এই জনক রাজার নন্দিনী। সীতাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে রামায়ণে লিখিত আছে যে, রাজর্ষি জনক একদিন হল দ্বারা ক্ষেত্র-শোধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, হল-পদ্ধতির মধ্যে একটি পরমা সুন্দরী বালিকা রহিয়াছে। এরূপ স্থানে এমন অলোক-সামান্যা বালিকাকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তখন তাড়াতাড়ি সেই বালিকাটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পরম যত্নে সেই বালিকার লালন-পালন করিতে লাগিলেন; এবং সীত অর্থাৎ হলমুখ হইতে বালিকা উত্থিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম 'সীতা' রাখিলেন। সীতা, রাজর্ষি জনককে তাঁহার পিতা ও তাঁহার পত্নীকে তাঁহার মাতা বলিয়াই জানিতেন।

জনক ও তাঁহার পত্নীর অপরিসীম স্নেহ ও যত্নে সীতা বাল্য ও কৈশোর কাল অতিক্রম করিলেন। তাঁহার ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন ও সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত কন্যারত্ন লাভ করিয়া জনক আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সহিত সীতার চরিত্রের মাধুর্য্য ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রূপে গুণে তাঁহার ন্যায় আর কেহ ছিল না। সীতার এমন রূপ ও এত গুণ

দেখিয়া সকলেরই মনে বিশ্বাস হইল যে, তিনি অগর্ভসম্ভূতা, নতুবা সামান্য-মানবীতে এত রূপ, এত গুণ কি সম্ভাব্য হইতে পারে! যে সমস্ত মুনিঋষি জনক-ভবনে আগমন করিতেন, তাঁহারা এত সুলক্ষণ একাধারে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন; এবং সীতা যে সামান্যা মানবী নহেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইত। রাজর্ষি জনক এমন রূপবতী গুণবতী কন্যাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। এমন কন্যারত্নকে কি যাহার তাহার হস্তে সমর্পণ করা যায়? তিনি কত রাজা ও রাজকুমারের কথা মনে করিতেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও সীতার স্বামী হইবার যোগ্য বলিয়া মনে স্থির করিতে পারিতেন না।

সে সময়ে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত নানা উপায়ে বর স্থির করা হইত।—কোন স্থলে কন্যার পিতা বা আত্মীয়-স্বজন নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত বর মনোনীত করিতেন এবং তাহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। অবশ্য, এই বরমনোনয়ন সম্বন্ধে কন্যারও মত গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। আবার কোন কোন স্থলে কন্যা স্বয়ংবরা হইতেন। বড় বড় রাজকন্যার বিবাহেই স্বয়ংবরের আয়োজন হইত। কন্যার পিতা স্বজাতীয় রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন; যাঁহারা বিবাহপ্রার্থী, তাঁহারা সকলেই এই নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভার অধিবেশন হইত এবং কন্যা বরমাল্য-হস্তে সভায় প্রবেশ করিতেন। তাহার পর সমাগত রাজা

ও যুবরাজগণের গুণাবলী কীর্ত্তিত হইলে, রাজকন্যা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহারই গলায় বরমাল্য অর্পণ করিতেন। এই দুইটি ব্যতীত আর একটি উপায়ও ক্ষত্রিয়-রাজ-সমাজে প্রচলিত ছিল। বিবাহ-প্রার্থী বরের বলের পরীক্ষা গৃহীত হইত। যিনি এই প্রকারে বা ঐ প্রকারে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন, তিনি কুমারীর উপযুক্ত বর হইবেন। রাজা জনক অনেক চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয়ানন্দ-দায়িনী দুহিতার বিবাহের জন্য এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করাই স্থির করিলেন।

কোন এক সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিবার জন্য এক প্রকাণ্ডকায় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে শরযোজনা করিয়া ক্রোধভরে দেবতাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের অংশ আমাকে প্রদান করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছ এবং তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছ। আমি তোমাদিগের এই অপরাধের শাস্তি-বিধান করিবার জন্য এই শরনিক্ষেপে তোমাদের সকলের বিনাশ-সাধন করিব। দেবগণ মহাদেবের কথা শুনিয়া মহা ভীত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তব করিয়া তাঁহার ক্রোধশান্তি করিলেন। মহাদেব তখন সেই বিশাল শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। দেবতারা এই হরধনু মহারাজ জনকের পূর্ব্ব-পুরুষ নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট রাখিয়া দিলেন। তদবধি হরধনু মিথিলা রাজ-গৃহেই ছিল। এমন প্রকাণ্ড ধনু সে সময়ে আর

কোথাও ছিল না, এবং তাহাতে জ্যারোপণ করা যাহার তাহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না ; এমন কি, সকলের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীতে এমন বীর অতি কমই আছেন—যিনি এই হরধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারেন। এক্ষণে মহারাজ জনকের সেই হরধনুর কথা স্মরণ হইল। তিনি চারিদিকে ঘোষণা করিলেন যে, যে মহাবীর এই হরধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে তিনি সীতাকে অর্পণ করিবেন। চারিদিকে যখন এই কথা রাষ্ট্র হইল, তখন নানা স্থান হইতে রাজগণ আসিয়া হরধনুতে জ্যারোপণের চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ধনুতে জ্যারোপণ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইল না : দলে দলে রাজা, রাজকুমার ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা অপমান বোধ করিয়া জনকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জনক তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলে, তাঁহারা ক্ষুণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাজ জনক যখন দেখিলেন যে, যত রাজা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হরধনুতে জ্যারোপণ দূরে থাকুক ধনুখানি উত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এই পৃথিবীতে হয় ত এমন ক্ষত্রিয় বীর কেহই নাই—যিনি এই হরধনু উত্তোলন করিতেও সমর্থ হইবেন। তাহা হইলে কি সীতার বিবাহ অসম্ভব হইবে ? কিন্তু উপায় নাই ; তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বীরাগ্রগণ্য ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজ দশরথ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। এই চারি পুত্রের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। মহারাজ দশরথ অনেক দিন অপুত্রক ছিলেন। পরে কুল-গুরু বসিষ্ঠ এবং অন্যান্য মুনি ঋষির আদেশে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে তাঁহার তিন মহিষী কৌসল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা গর্ভ-ধারণ করেন, এবং কৌসল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কেকয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ দশরথ পুত্র চারিটির শিক্ষাবিধানের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি ভ্রাতা যেমন রূপে অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনই নানা গুণে ভূষিত হইয়া-ছিলেন ; তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বীরত্ব দর্শন করিয়া পৌরবর্গ মহা আনন্দিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দশরথ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া তাঁহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যজ্ঞ শেষ হইতে না

কোথাও ছিল না, এবং তাহাতে জ্যারোপণ করা যা[illegible]
তাহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না ; এমন কি, সকলের বিশ্বাস ছিল যে,
পৃথিবীতে এমন বীর অতি কমই আছেন—যিনি এই হরধনুতে
জ্যারোপণ করিতে পারেন। এক্ষণে মহারাজ জনকের সেই
হরধনুর কথা স্মরণ হইল। তিনি চারিদিকে ঘোষণা করিলেন
যে, যে মহাবীর এই হরধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন,
তাঁহারই হস্তে তিনি সীতাকে অর্পণ করিবেন। চারিদিকে
যখন এই কথা রাষ্ট্র হইল, তখন নানা স্থান হইতে রাজগণ
আসিয়া হরধনুতে জ্যারোপণের চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সেই
প্রকাণ্ড ধনুতে জ্যারোপণ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইল না :
দলে দলে রাজা, রাজকুমার ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে
লাগিলেন। কেহ কেহ বা অপমান বোধ করিয়া জনকের সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জনক তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলে,
তাঁহারা ক্ষুণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাজ
জনক যখন দেখিলেন যে, যত রাজা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা
হরধনুতে জ্যারোপণ দূরে থাকুক ধনুখানি উত্তোলন করিতেও
সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। তিনি
ভাবিলেন, এই পৃথিবীতে হয় ত এমন ক্ষত্রিয় বীর কেহই নাই-
যিনি এই হরধনু উত্তোলন করিতেও সমর্থ হইবেন। তা
হইলে কি সীতার বিবাহ অসম্ভব হইবে ? কিন্তু উপায় নাই
তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বীরাগ্রগণ্য ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজ দশরথ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। এই চারি পুত্রের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। মহারাজ দশরথ অনেক দিন অপুত্রক ছিলেন। পরে কুল-গুরু বসিষ্ঠ এবং অন্যান্য মুনি ঋষির আদেশে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে তাঁহার তিন মহিষী কৌসল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা গর্ভ-ধারণ করেন, এবং কৌসল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কেকয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ দশরথ পুত্র চারিটির শিক্ষাবিধানের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি ভ্রাতা যেমন রূপে অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনই নানা গুণে ভূষিত হইয়া-ছিলেন; তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বীরত্ব দর্শন করিয়া পৌরবর্গ মহা আনন্দিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দশরথ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া তাঁহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যজ্ঞ শেষ হইতে না

হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে দুইজন রাক্ষস আসিয়া যজ্ঞ-বেদীতে মাংস-খণ্ড নিক্ষেপ ও রুধির-ধারা বর্ষণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই জন্য অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, রাজ-পুত্র রামচন্দ্র মহাবীর। তিনি স্বীয় দিব্য তেজঃ-প্রভাবে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের নিধন-সাধনে সমর্থ হইবেন। অতএব কয়েক দিনের জন্য রামচন্দ্রকে তাঁহার আশ্রমে প্রেরণ করিতে হইবে।

মহর্ষির কথা শুনিয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত ভীত হইলেন। রামচন্দ্র যুদ্ধ-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেও তিনি কি মারীচ ও সুবাহুকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন? পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজ দশরথ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মহর্ষি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামকে ঋষির হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ রামের বড়ই অনুগত ছিলেন; তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। মহর্ষির অনুমতি গ্রহণ করিয়া তিনিও রামের অনুগমন করিলেন।

যথাসময়ে রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র মহর্ষির আশ্রমকে নিরাপদ করিলেন। মহর্ষি হৃষ্টচিত্তে তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিলেন। তখন একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে হরধনুর বিবরণ বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, রাজর্ষি জনক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে

মহাবীর সেই হরধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে তিনি তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না পরমা সুন্দরী দুহিতা সীতাকে সমর্পণ করিবেন। এই হরধনুতে জ্যারোপণ করিবার জন্য কত দেশের কত মহাবীর রাজর্ষি জনকের গৃহে সমাগত হইয়াছিলেন; কিন্তু জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক—কেহই সে প্রকাণ্ডকায় হরধনু উত্তোলন করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। মহর্ষির এই বাক্য শুনিয়া হরধনু দর্শনের জন্য রামচন্দ্রের বীর-হৃদয়ে বিশেষ কুতূহলের সঞ্চার হইল। তিনি মহর্ষির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে হরধনু-দর্শন-বাসনা নিবেদন করিলে, মহর্ষি হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে জনকরাজ-গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা রাজর্ষি জনকের ভবনে উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র মহারাজ জনকের নিকট রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনার আলয়ে যে হরধনু সংগৃহীত আছে, উহার দর্শনার্থী হইয়া এই ত্রিলোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয়কুমার-দ্বয় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; ইঁহারা হরধনু-দর্শনে সফল-মনোরথ হইয়া গৃহে গমন করিবেন।"

তখন রাজর্ষি জনকের আদেশে অনেকগুলি দীর্ঘাকার হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ মনুষ্য অতি কষ্টে ধনুখানি আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে আনয়ন করিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন রামকে কহিলেন, "বৎস রাম, এই হরধনু অবলোকন কর।" রাম তখন ধনুর

মঞ্জুষা অপসারণ করিয়া কহিলেন, "আমি কি ইহা উত্তোলন ও আকর্ষণ করিব?" মহারাজ ও মহর্ষি সম্মতি প্রদান করিলে, রামচন্দ্র সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে মৌর্ব্বী সংযোগ করিলেন এবং আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ আকর্ষণেই কোদণ্ডবর ভগ্ন হইয়া গেল। সকলে রামচন্দ্রের এই অলৌকিক বলবত্তার পরিচয় পাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

তখন রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি জানকীর পরিণয়-বিষয়ে বিষম সন্দিহান হইয়াছিলাম। এই ধনুর্ভঙ্গব্যাপার যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা আমি মনেও ভাবিতে পারি নাই। আমি সীতাকে বীরত্বশুল্কা বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা এতদিনে সত্য হইল। আমি আমার প্রাণতুল্যা দুহিতা সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রেরই হস্তে সমর্পণ করিব। আপনার অনুমতি হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত কথা নিবেদন করিবার জন্য অযোধ্যায় মহারাজ দশরথের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পারি।" বিশ্বামিত্র হৃষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলে, তৎক্ষণাৎ অযোধ্যায় দূত প্রেরিত হইল।

এদিকে সীতাদেবী যখন শুনিলেন যে, দশরথ-তনয় রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে হরধনু ভগ্ন করিয়াছেন এবং তৎপরে যখন পৌরবর্গ সহস্র-মুখে রামচন্দ্রের রূপ, গুণ ও অলোকসামান্য বলবত্তার প্রশংসা করিতেছে, তখন তাঁহার হৃদয়

রামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিশেষতঃ রাজর্ষি জনক এই ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বড়ই চিন্তাকুলচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই বিশাল হরধনু কেহই ভগ্ন করিতে পারিবে না; তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না দুহিতারও বিবাহ ঘটিবে না। এক্ষণে রামচন্দ্র সেই হরধনু ভগ্ন করিয়াছেন শুনিয়া সীতাদেবী মনে মনে স্থির করিলেন, যিনি তাঁহার পিতাকে চিন্তামুক্ত করিয়াছেন, তিনি রূপগুণ-শালী হউন আর না হউন, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা এবং সেই পতির চরণে মনঃ জীবন সমর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহার পর যখন রামচন্দ্রের রূপ, গুণ, মহনীয় চরিত্র প্রভৃতির কথা শ্রবণ করিলেন, তখন যে তাঁহার হৃদয় রামময় হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

কয়েক দিবসের মধ্যেই ভরত, শত্রুঘ্ন, কুলগুরু বসিষ্ঠ এবং বহুসংখ্যক অনুচর-সমভিব্যাহারে মহারাজ দশরথ জনক-ভবনে সমাগত হইলেন। মহাত্মা জনকও তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিয়া মহারাজ দশরথের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত জনকের অপরা তনয়া ঊর্ম্মিলার এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত জনকরাজের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির যথাক্রমে বিবাহ স্থির করিলেন। যথাসময়ে বিবাহকার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। সীতাদেবী রামচন্দ্রের সুকুমার কান্তি এবং

সৌম্য ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন ; জীবনে মরণে ছায়ার ন্যায় রামচন্দ্রের অনুগত থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইলেন। রামও নবপরিণীতা সীতার সরল ও পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চিরদিনের জন্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিবাহের পরদিনে বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজর্ষি জনক কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে অসংখ্য গো, অশ্ব, হস্তী, মণি, মুক্তা, বসন, ভূষণ, রথ, পদাতি, দাস, দাসী প্রভৃতি কন্যাধনস্বরূপ প্রদান করিলেন।

মহারাজ দশরথ পুত্র ও বধূগণ-সমভিব্যাহারে অযোধ্যা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে মহাবীর পরশুরাম তাঁহাদিগের গতিরোধ করিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "হে বীরাগ্রগণ্য দশরথতনয় রাম! আমি তোমার ধনুর্ভঙ্গব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি। তুমি আমার হস্তস্থিত শরাসনে শরসন্ধান করিয়া আকর্ষণ ও তোমার বল প্রদর্শন কর। এই ধনুর আকর্ষণে তোমার বল পরীক্ষা করিয়া তবে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।"

জামদগ্ন্যের এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার হস্ত হইতে সেই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যারোপণ ও শরসন্ধান করিয়া কহিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ—আমার পূজ্য। সেই কারণে আপনার উপর এই শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে অনুমতি করুন,

এই শর দ্বারা আপনার তপোবলসঞ্চিত যথেচ্ছ গতি এবং আপনার পুণ্যলোক এতদুভয়ের কোন্‌টি আমি নষ্ট করিব? আপনি জানেন, এই শরসন্ধান কখনও ব্যর্থ হইবার নহে।” তখন জামদগ্ন্য দুর্ব্বল হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “হে বীরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যথেচ্ছ গতি নাশ করিও না; আমি তপোবলে যে সমস্ত পুণ্যলোক অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাই তুমি নষ্ট করিয়া দাও।”

তখন রামচন্দ্র সেই অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরে পরশুরামের তপোবলার্জ্জিত সমুদায় পুণ্যলোক নষ্ট হইল। তিনি নীরবে মহেন্দ্র-পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ দশরথ তখন মহা আনন্দে অযোধ্যায় গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সীতাদেবী অযোধ্যার রাজভবনে উপস্থিত হইলে চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। সমস্ত অযোধ্যা-নগরী সীতাদেবীকে দর্শন করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইল। যে সীতাদেবীকে দেখিল, সেই বলিল যে, সত্যসত্যই অযোধ্যার রাজভবনে লক্ষ্মীর আগমন হইল। কৌসল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা নববধূদিগকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। মহারাজ দশরথের সংসার প্রকৃতই সুখের সংসার হইল।

দেখিতে দেখিতে বার বৎসর চলিয়া গেল। রামচন্দ্র পিতার নিকট রাজ্যশাসননীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সীতার ব্যবহারেও রাজ্যের সমস্ত লোক তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইহাতে রামচন্দ্রের হৃদয়ে যে সুখের সঞ্চার হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এদিকে বার্দ্ধক্য আসিয়া মহারাজ দশরথকে আক্রমণ করিল। তিনি তখন আর সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীরামচন্দ্র পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহার অনেক সাহায্য করিতেন। প্রজামণ্ডলী রাম-চন্দ্রের রাজ্যশাসনপ্রণালী দর্শন করিয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। মহারাজ দশরথ প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের

সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন। অবশেষে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, লোকাভিরাম রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। এই সম্বন্ধে দেশের জনগণ, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের মত জানিবার জন্য তিনি একদিন সকলকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও রাজবৃন্দ সমাগত হইলে তিনি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, সকলের যদি ইহাতে সম্মতি হয়, তাহা হইলে তিনি সেইরূপ আয়োজন করিতে পারেন।

রাজা দশরথের কথা শেষ হইলে, সমাগত জনমণ্ডলী একবাক্যে তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন ; সকলেই বলিলেন যে, রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে তাঁহারা পরম আনন্দ লাভ করিবেন। মহারাজ দশরথ তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্য অভিষেকের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন এবং পর দিনই যথারীতি অভিষেকের ব্যবস্থা করিবার জন্য অমাত্যবর্গের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সুসংবাদ অযোধ্যা-নগরীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। প্রজাগণ যুবরাজ রামচন্দ্রের মঙ্গল-কামনায় নানাবিধ অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজনে মত্ত হইল। অযোধ্যানগরী দেখিতে দেখিতে উৎসবের বেশ পরিধান করিল। রাজপ্রাসাদেও নানা প্রকার আয়োজন আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে ? কে

জানিত যে, এমন আনন্দের পুরীতে বিষধর সর্প বাস করিতেছে? কে জানিত যে, দেখিতে দেখিতে এই আনন্দ গভীর নিরানন্দে পরিণত হইবে? সকলই লীলাময়ের ইচ্ছা।

মহারাজ দশরথের মধ্যমা রাণী কেকয়ীর একটি দাসী ছিল; তাহার নাম মন্থরা। এই দাসীটি কেকয়ীর বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিল। মন্থরা বালিকাকাল হইতেই কেকয়ীকে লালনপালন করিয়া আসিতেছে; কেকয়ী স্বামীগৃহে আগমন-সময়ে মন্থরাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। মন্থরা কুব্জা ছিল; তাহার বয়সও অধিক হইয়াছিল। কেকয়ী এই মন্থরার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিতেন না। মন্থরার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়াই তিনি বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন।

দাসী মন্থরা যখন শুনিল যে, মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয়ে ঘোর হিংসার আবির্ভাব হইল। সে ভাবিল, রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে রাণী কৌসল্যারই ঐকাধিপত্য হইবে, কেকয়ীকে কেহই গ্রাহ্য করিবে না; কেকয়ীর পুত্র ভরত সামান্য দাসের ন্যায় রাজভবনে থাকিবে। এই সকল কথা সে যত ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হিংসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে তখন রামের সর্ব্বনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সহসা সে যেন অকূল সাগরে

কূল পাইল; তাহার অপ্রসন্নতা দূর হইল। সে তখন দ্রুতপদে কেকয়ীর মহলে প্রবেশ করিল।

রাণী কেকয়ী তখন পর্য্যন্ত রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। মন্থরা কেকয়ীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া যখন তাঁহাকে এই বার্ত্তা প্রদান করিল, তখন তিনি আনন্দ-উৎফুল্ল-হৃদয়ে কণ্ঠহার উন্মোচন পূর্ব্বক এই শুভসংবাদ প্রদানের জন্য মন্থরাকে পুরস্কার দান করিলেন। মন্থরা রাণীর প্রদত্ত হার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধভরে ভৎর্সনা করিতে করিতে কেকয়ীকে বলিল যে, "তোমার এত বয়স হইল তবুও জ্ঞান হইল না; কিসে ভাল, কিসে মন্দ হয়, তাহা এখনও বুঝিতে পারিলে না!" কেকয়ী প্রথমে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পর মন্থরা যখন একে একে মনোহর কুযুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে ভবিষ্যতের চিত্র প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন কেকয়ীর কুবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার মঙ্গল নাই।

তখন তিনি মন্থরাকে ধরিয়া বসিলেন; কি করিলে এই অভিষেক কার্য্য বন্ধ করা যায় তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্থরা পূর্ব্বেই সে কথা স্থির করিয়াছিল। সে তখন বলিল, "তোমার ত কিছুই মনে থাকে না। অনেক দিন পূর্ব্বে মহারাজ দশরথ শম্বর নামক অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আহত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তুমি প্রাণপণে সেবা করিয়া

তাঁহাকে সুস্থ করিয়াছিলে। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন ; তুমি সময়ান্তরে বর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলে। আজ সেই সময় উপস্থিত। তুমি আজ মহারাজের নিকট সেই দুইটি বর প্রার্থনা কর। এক বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক।” মন্থরার এই পরামর্শই কেকয়ী গ্রহণ করিলেন এবং রাজার প্রতি অভিমান করিয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন।

এদিকে সভাভঙ্গ হইলেই মহারাজ দশরথ রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের শুভসংবাদ সর্ব্বাগ্রে প্রিয়তমা মহিষী কেকয়ীকে দিবার জন্য তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কেকয়ীকে ধরাশায়িনী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য নানা চেস্টা করিতে লাগিলেন। কেকয়ী অনেকক্ষণ অভিমান প্রকাশ করিয়া অবশেষে বরের কথা তুলিলেন। সরলহৃদয় দশরথ কেকয়ীর কু-অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত দুইটি বর দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন কেকয়ী তাঁহার হৃদয়ে দুইটি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথ কেকয়ীর কথা শুনিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কাতর-বচনে, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কেকয়ীর কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ; ঐ দুইটি বরের পরিবর্ত্তে তিনি যাহা চাহিবেন তাহাই দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু কেকয়ী কিছুতেই

সম্মত হইলেন না; বরঞ্চ দশরথকে নানা কথায় মর্ম্মপীড়া দিতে লাগিলেন। দশরথ মৃতপ্রায় হইলেন।

সময় চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেকয়ী রামচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামচন্দ্র কেকয়ীর কক্ষে উপস্থিত হইয়া পিতার অবস্থা দর্শনে আকুল হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রূরমতি কেকয়ী তখন অম্লান-বদনে রামচন্দ্রকে সমস্ত কথা বলিলেন। মহামতি পিতৃপরায়ণ রামচন্দ্র অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "মা, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, ইহা ত অতি সামান্য কথা; পিতার আদেশ হইলে আমি এই দণ্ডে আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিতেও পারি। পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমি অবিলম্বেই বল্কল পরিধানপূর্ব্বক পুরত্যাগ করিতেছি। আমি কেবল একবার মাতা কৌসল্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব; তাহার পর আর সকলকে বলিয়া বনবাসে গমন করিব।" এই বলিয়া তিনি প্রথমে পিতা ও পরে মাতার চরণবন্দনা করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রামচন্দ্র বিমাতার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মাতা কৌসল্যার নিকট গমন করিলেন। রাণী কৌসল্যা তখন পুত্রের মঙ্গলার্থ নানা দেবতার অর্চ্চনায় নিযুক্তা ছিলেন। রামকে আসিতে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। হায়, তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার হৃদয়ে কি বিষম

শেলাঘাত করিবার জন্য রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ভক্তিভরে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া পিতার দুই বরের কথা বলিলেন। অকস্মাৎ এমন নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৌসল্যা অচেতন হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। তাহার পর যখন সকলে শুনিল যে, রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতেছেন, তখন সকলের শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সমস্ত অযোধ্যানগরীর বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং রাণী কেকয়ীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। এই শোচনীয় সংবাদ যখন লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রামকে কিছুতেই বনে যাইতে দিবেন না বলিয়া তিনি ক্রোধোন্মত্তচিত্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রামকে সকল কথা বলিলেন। ধীর রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, পিতৃ-সত্য পালনের জন্য রাম বনে গমন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন। তখন তিনিও রামের সহিত বনগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাম তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; লক্ষ্মণের সঙ্কল্প অটল রহিল।

তাহার পর দুই ভাই সীতার নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র পরদিন রাজা হইবেন, এই কথা

শ্রবণ করিয়া সীতা আনন্দসাগরে নিমগ্না ছিলেন। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র যখন ধীরভাবে গম্ভীরবদনে সীতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন স্বামীর এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া পতিপরায়ণা সীতাদেবী আকুল হইয়া পড়িলেন। না জানি কি বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল ; তাঁহার সদা-প্রসন্ন বদন মলিন হইয়া গেল, তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না ; তিনি রামচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না ; নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সীতাকে এই প্রকার অবস্থাপন্না দেখিয়া করুণহৃদয় রামচন্দ্রের আর সহ্য হইল না ; তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর ধারণ করিলেন। সীতা যেন এতক্ষণ পরে প্রাণ পাইলেন ; তাঁহার বাক্‌শক্তি যেন ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন "প্রভু, তোমার এমন ভাবান্তর দেখিতেছি কেন ? তোমার মুখ গম্ভীর কেন ? আজ এই মহানন্দের দিনে তুমি এমন হইলে কেন ? তোমার মুখে হাসি নাই কেন ?"

রামচন্দ্র তখন বলিলেন, "সীতা, আমি পিতার আদেশে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাইতেছি। তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। তুমি গৃহে থাকিয়া আমার বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিও। স্বামি-সেবার পরই সংসার-সেবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে

আর অধিক কি উপদেশ দিব! প্রাণাধিক লক্ষ্মণ আমার সহিত বনে যাইতেছেন। আমাদের কোন কষ্ট হইবে না। চৌদ্দ বৎসর পরে আবার ফিরিয়া আসিব। তুমি এই চৌদ্দ বৎসর এই বৃহৎ রাজ-পরিবারের সেবা করিবে। আমার জন্য চিন্তা করিও না; ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।”

সীতাদেবী ধীরভাবে রামচন্দ্রের কথাগুলি শ্রবণ করিলেন। অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে এমন অবস্থায় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িতেন; এমন অবস্থাবিপর্য্যয় পুরুষেই সহ্য করিতে পারেন না, নারীর কথা ত দূরে। কিন্তু সীতা ত যেমন তেমন নারী নহেন, তিনি যে নারীকুলশিরোমণি, তিনি যে দেবী, তাঁহার হৃদয় যে সামান্য ভোগসুখকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। নারীর যাহা কর্ত্তব্য, পত্নীর যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য, সে উপদেশ সীতাকে দিবার প্রয়োজন ছিল না! রামচন্দ্র রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া বনে যাইতেছেন, ইহাতে তিনি একটুও দুঃখিত হইলেন না। পিতৃ-সত্য-পালনের জন্য তাঁহার স্বামী অনায়াসে সমস্ত সুখ, সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যে কালযাপন করিতে যাইতেছেন, ইহা ত তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা, শ্লাঘার কথা। কত তপস্যা করিয়া তিনি এমন স্বামিরত্ন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া সাধ্বী সীতাদেবী বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি মনে করিলেন, রামচন্দ্র এতদিনেও কি তাঁহাকে চিনিতে

পারেন নাই? তিনি কি সীতাকে সামান্যা নারী বলিয়া মনে করেন? নতুবা তিনি সীতাকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিবেন কেন? তাই তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "নাথ! তুমি কি মনে ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না! তুমি যাহা কহিলে, ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য ও একান্তই অপযশের; এমন কি, এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। নাথ! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য সম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না; ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদ-শিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্ত্রী স্বামীর চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতামাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ, তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশ কণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমিও অশঙ্কিত মনে আমাকে সঙ্গিনী

করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই যে, আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, কেবল তোমার নিকট অবস্থানই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহনীয় নহে। এখন এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমায় কোন কথাই বলিও না। আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে। তোমার সঙ্গে থাকিলে আমি কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিব না; তোমার মুখ দেখিলে আমি সহাস্য-বদনে সমস্ত সহ্য করিতে পারিব।"

রামচন্দ্র তখন সীতাকে অনেকরূপে বুঝাইতে লাগিলেন। বন অতি ভীষণ স্থান। সেখানে কত হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে, সেখানে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। তাহার পর, যে সীতা এতকাল রাজ্যসুখভোগ করিয়াছে, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হইতেছে, তাহার পক্ষে পদ-ব্রজে বন-ভ্রমণ, ফলমূল আহার, নির্ঝরের বারিতে তৃষ্ণা নিবারণ, বৃক্ষতলে বা অনাবৃত আকাশতলে শয়ন; এ সকল কি তাহার সহ্য হইবে। কিন্তু সীতা কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন—

"তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি, তুমি থাকিলে নিকটে ॥

তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলা লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চূয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ-গৃহ নহে তার সমতুল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে যদি করিয়া ভ্রমণ।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥”

রামচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাকে গৃহে রাখিয়া যাওয়া অসম্ভব। তখন অগত্যা তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন।

তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুরী পরিত্যাগ করিলেন। অযোধ্যাবাসিগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। সকলেই গৃহত্যাগ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইল এবং রামের অনুগমন করিতে লাগিল। তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিল, “আমরা এ পাপপুরীতে বাস করিব না। আমাদের রাম যেখানে গমন করিবেন, আমরা সেইখানেই যাইব।” এই বলিয়া অযোধ্যার নরনারী সকলেই রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহা-দিগকে নানা কথা বলিয়া প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিতে বলিলেন। রামের কাতর-বাক্য তাহারা লঙ্ঘন করিতে পারিল না। সকলে শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া করুণ-হৃদয় রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তিনি অশ্রুসংবরণ

করিতে পারিলেন না। তিনি তখন সুমন্ত্রকে সত্বর সে স্থান ত্যাগ করিতে অনুমতি করিলেন। সারথি সুমন্ত্র রথ লইয়া অগ্রে চলিতে লাগিলেন, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ধীরে ধীরে অযোধ্যানগরী তাঁহাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও সুমন্ত্র যখন তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন দিবা-অবসান হইয়াছে। তাঁহারা বনবাসের প্রথম রজনী পুণ্যসলিলা তমসার তীরেই অতিবাহিত করিলেন। লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা রচনা করিয়া দিলেন; প্রকৃতির নীল চন্দ্রাতপতলে রাজপুত্র ও রাজকুলবধূ শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র প্রহরীস্বরূপ জাগিয়া থাকিলেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই গুহ চণ্ডালের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। গুহ রামচন্দ্রের বাল্যকালের সখা ছিলেন। গুহ যখন শুনিলেন যে, রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে সমাগত হইয়াছেন, তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মুখে যখন তাঁহাদের আগমনের কারণ শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার ক্ষোভের সীমা থাকিল না। গুহ রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহার রাজ্যেই বাস করিতে বলিলেন; কিন্তু রাম তাহাতে সম্মত হইলেন না। সে দিন গুহের রাজধানীতেই তাঁহারা অবস্থান করিলেন। এইবার তাঁহাদিগকে গঙ্গাপার হইতে হইবে। গুহ তাঁহাদের পারের জন্য তরী আনাইয়া দিলেন। এখান হইতেই তাঁহারা সুমন্ত্রকে বিদায় করিলেন। সুমন্ত্র কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য-প্রাণে শূন্য

অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পূর্ব্বেই বল্কল পরিধান করিয়াছিলেন; এইখানে তাঁহারা বটনির্য্যাস দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে মিত্র গুহের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপার হইলেন। দুই দিন অবিশ্রান্ত পথি-ভ্রমণের পর তাঁহারা প্রয়াগের নিকট মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সীতাদেবী কোন দিন পদব্রজে ভ্রমণ করেন নাই, কোন দিন ফলমূল আহার করিয়া দিনযাপন করেন নাই, কোন দিন বৃক্ষতলে পর্ণশয্যায় শয়ন করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে এখন এ সকলই সহ্য করিতে হইল। যখন পথিশ্রমে বা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি কাতরা হইতেন, তখন রামের মুখের দিকে চাহিতেন, আর তাঁহার সকল কষ্ট, সকল শ্রান্তি দূর হইয়া যাইত। অতুলনীয় পতিভক্তি তাঁহাকে সমস্তই সহ্য করিতে শিখাইতে লাগিল। তিনি মনে করিতেন, স্বামীর সঙ্গে থাকিলে অদৃষ্টে যাহাই হইবে, স্ত্রীর পক্ষে তাহাই মঙ্গল।

রামের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজমুনি পরম সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন; তাঁহারা সে দিন মুনির আশ্রমেই আতিথ্য স্বীকার করিলেন। পরদিন রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিবর! আমরা কোন জনশূন্য আশ্রমে বাস করিতে চাই। আপনি এই প্রকার একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" ভরদ্বাজ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দশক্রোশ দূরবর্ত্তী যমুনার অপর পারে চিত্রকূট পর্ব্বতে

বাস করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন। তাঁহারা তখন মুনিবরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক একখানি ভেলার সাহায্যে যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ সেই স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন; তাঁহারা সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে সামান্য কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। সীতা ভাবিলেন, "এই আমার দুর্গ, এই কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ!"

এদিকে অযোধ্যায় ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। রামচন্দ্র বিদায় লইবার পর হইতে বৃদ্ধ রাজা দশরথ আর শয্যাত্যাগ করেন নাই। পুত্র-শোকে তৎপরদিনই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। মৃত মহারাজের সৎকার কি করিয়া হয়, ইহাই তখন অমাত্যবর্গের চিন্তার বিষয় হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ছিলেন না; তাঁহারা মাতুলালয়ে ছিলেন; অযোধ্যার কোন সংবাদই তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। অমাত্যগণ তখন ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া সকল কথা শুনিলেন। ভরতের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পিতৃশোকে অধীর হইলেন; মায়ের ব্যবহারে ঘৃণায় ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। যথাসময়ে পিতার কার্য্য শেষ করিয়া মহামতি ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য অমাত্যবর্গ ও পৌরজন সহ যাত্রা করিলেন। তিনি বলিলেন,

তিনি কিছুতেই এ রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। শ্রীরামচন্দ্র যদি আসিতে চান ভালই, নতুবা তিনিও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত বনবাস করিবেন।

নানাস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সন্ন্যাসীর বেশ ও তাঁহাদের পর্ণকুটীর দর্শন করিয়া ভরতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি রামচন্দ্রের চরণ ধরিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র ভরতকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহারা সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন ; পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতেই হইবে ; পিতৃসত্য পালনের জন্য ভরতকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যশাসন করিতেই হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলে তিনি পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবেন। ভরত তখন অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামের পাদুকা-যুগল ন্যাস-স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। রাম এ প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না ; ভরত সেই পাদুকা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন না ; নন্দীগ্রামে সিংহাসন স্থাপিত হইল এবং সেই পাদুকা-যুগল সিংহাসনে বসাইয়া তিনি তপস্বীর বেশে সেই সিংহাসনতলে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে চিত্রকূট পর্ব্বতে কিছুদিন পরেই রাক্ষসদিগের বিষম উপদ্রব আরম্ভ হইল। যে সমস্ত তপস্বী এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সাধন ভজনের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তাঁহারা তখন স্থানান্তরে গমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রামচন্দ্রও দেখিলেন যে, চিত্রকূটে বাস করা আর নিরাপদ নহে; তখন তিনিও চিত্রকূট ত্যাগ করিলেন। নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। এই অরণ্যের মধ্যে পঞ্চবটী বন তাঁহাদের বড়ই ভাল লাগিল; পঞ্চবটি গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রকৃতিদেবী এই স্থানটিকে যেন সর্ব্বপ্রযত্নে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা এই পঞ্চবটী বনেই বনবাসকাল অতিবাহিত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। গোদাবরীতীরে কুটীর নির্ম্মিত হইল। সীতা বনদেবীর ন্যায় বনভূমি আলোকিত করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরম সুখে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। তখন এক অতর্কিত বিপদে পড়িয়া তাঁহাদিগকে এই সুখের বাসা ভাঙ্গিতে হইল।

একদিন রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ কুটীরে বসিয়া আছেন, এমন সময় শূর্পণখা-নাম্নী এক রাক্ষসী বনভ্রমণ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল। রাম ও লক্ষ্মণের অনুপম রূপ দর্শনে তাঁহাদের একজনকে পতিত্বে বরণ করিবার বাসনা রাক্ষসীর মনে সমুদিত হইল। সে নিতান্ত নির্লজ্জার ন্যায়

সীতার সম্মুখেই রাম ও লক্ষ্মণের নিকট তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিল। রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। রাক্ষসী ইহাতে অপমান বোধ করিয়া সীতাদেবীকে ভক্ষণ করিবার জন্য বদনব্যাদান করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। লক্ষ্মণ তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; স্ত্রী-হত্যা মহা পাপ মনে করিয়া খড়্গ দ্বারা শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন ; রাক্ষসী চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

লঙ্কার অধিপতি মহাপরাক্রান্ত রাক্ষস-রাজ রাবণ শূর্পণখার জ্যেষ্ঠ মাতৃস্বসেয় ভ্রাতা। রাবণ শূর্পণখাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিধবা শূর্পণখা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষা ছিল ; সে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। গভীর দণ্ডকারণ্যে সে অনেক সময়ে বাস করিত। রাবণ ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খর ও দূষণ নামক দুই ভ্রাতার অধীনতায় চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য দিয়াছিলেন। তাহারা পঞ্চবটীর অদূরে জনস্থান নামক স্থানে বাস করিত। শূর্পণখা ছিন্ননাসাকর্ণ হইয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং সমস্ত কথা তাহাদের নিকট বলিল। খর ও দূষণ এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ; সন্ন্যাসীর এত বড় সাহস যে দেবদর্পহারী রাবণ-রাজার ভগিনীকে অপমান করে ! কেবল কি অপমান, তাহাকে চিরদিনের জন্য নাসাকর্ণবিহীন করিয়া দেয় ! এখনই সেই পামরদিগের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে হইবে ! অমনি

চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-সেনা দুইটি সন্ন্যাসীর বধের জন্য বনভূমি কম্পিত করিয়া যাত্রা করিল। আশ্রমকুটীরে বসিয়াই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এই কোলাহল শুনিতে পাইলেন। নিশ্চয়ই কোন বিপদ উপস্থিত হইবে স্থির করিয়া রাম লক্ষ্মণ সতর্ক হইলেন। রামচন্দ্র জানকীকে নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া এবং লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া একাকী ধনুর্ব্বাণ-হস্তে কুটীরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ হইতে রাক্ষসসৈন্য কুটীর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর রামচন্দ্র একটুও ভীত হইলেন না; তিনি অটল ভূধরের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। একদিকে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য এবং তাহাদের অধিনায়ক খর ও দূষণ, অপরদিকে ধনুর্ব্বাণ-হস্ত একাকী রামচন্দ্র! রাক্ষসেরা এমন নির্ভীক বীরপুরুষ কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইল। তাহার পরেই বিপুল বিক্রমসহকারে তাহারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। চারিদিক্ হইতে তাঁহার উপর অস্ত্রবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; তিনি অবিশ্রান্ত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দলে দলে রাক্ষস-সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। তাঁহার অপূর্ব্ব রণকৌশল দর্শনে রাক্ষসগণ ভীত হইল, কিন্তু কেহই রণস্থল

ত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রমে খর ও দূষণ রামের শরে নিহত হইল; চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যই সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধশেষ হইলে জানকী লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং স্বামীর অতুল বিক্রম দর্শনে বিস্মিত হইলেন; সীতাদেবী তখন রামের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য সময়োচিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যুদ্ধজয়ের ইহা অপেক্ষা উচ্চ পুরস্কার আর কি হইতে পারে!

শূর্পণখা যুদ্ধস্থল হইতে বহুদূরে থাকিয়া এই ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল। সে যখন দেখিল যে, খর ও দূষণ এতগুলি সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল, তখন সে আর সে প্রদেশে বাস করা সঙ্গত মনে করিল না, তাহার নাসাকর্ণ-চ্ছেদকারীদিগের শাস্তিবিধানের চেষ্টা সে তখনও ত্যাগ করিতে পারিল না। তখন সে বহুদূরবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপে ভ্রাতার সমীপে গমন করিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল। সে বলিল যে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহার যে অপমান করিয়াছে, সে চিহ্ন ত' তাহার শরীরেই বিদ্যমান রহিয়াছে। সামান্য দুইটা মানুষে মহাবল রাবণের ভগিনীর এমন অপমান করিবে, আর রাবণ তাহার প্রতিবিধান করিবে না, ইহাতে যে রাবণের কলঙ্ক হইবে। তাহার পর রাবণের মনকে আরও নরম করিবার জন্য সে বলিল, "রাম লক্ষ্মণের সহিত একটি সুন্দরী রমণী আছে। তাহার নাম সীতা। সে রামের স্ত্রী। এমন

সুন্দরী রমণী আমি কেন, তুমিও কখন দেখ নাই। তুমি কত স্থান হইতে কত সুন্দরী আনিয়া তোমার দাসী করিয়াছ, কিন্তু সীতার পদনখের সহিতও তাহাদের তুলনা হয় না। তুমি সেই সীতাকে অপহরণ করিয়া এখানে লইয়া এস। তাহা হইলে সীতার শোকে রামচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিবে, রামের শোকে তাহার ছোট ভাই লক্ষ্মণও প্রাণতাগ করিবে। ইহাতে আমারও বৈরনির্য্যাতন-বাসনা পরিতৃপ্ত হইবে, তোমারও পরমসুন্দরী রমণী লাভ হইবে। অথচ এজন্য যুদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু রামের যে প্রকার অতুল বিক্রম দেখিলাম, তাহাতে তাহার নিকট হইতে সীতাকে কাড়িয়া আনা একেবারে অসম্ভব হইবে; এ কার্য্য কৌশলে সিদ্ধ করিতে হইবে।"

রাবণের ন্যায় দুরাচার ও অত্যাচারী রাজা সে সময়ে ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার ভয়ে সকলেই ভীত হইত! এমন অন্যায্য কার্য্য ছিল না, যাহার অনুষ্ঠান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। ভগিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার মন গরম হইল। তিনি তখন সীতাকে অপহরণ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। পাপীর পাপকার্য্য সম্পাদনের উপায়ের অভাব হয় না! রাবণের আর বিলম্ব সহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া জনস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মারীচ নামে এক মায়াবী রাক্ষস বাস করিত। রাবণ মারীচের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন যে,

তাহাকে মনোহর স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাদেবীর সম্মুখে খেলা করিয়া বেড়াইতে হইবে। তাহার পর সীতাদেবী তাহাকে পাইবার জন্য নিশ্চয়ই রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিবেন ; রামচন্দ্র পতিপ্রাণা স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পরিয়া তাহাকে ধরিতে আসিবেন। তখন তাহাকে দ্রুতগতিতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে ; রামও তাহার অনুসন্ধানে সেই বনে প্রবিষ্ট হইবেন। তখন মারীচ 'হা লক্ষ্মণ, হা সীতা' বলিয়া চীৎকার করিবে। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরে স্থির করা যাইবে।

রামের এই কথা শুনিয়া মারীচ বলিল, "মহারাজ, এমন কর্ম্ম করিও না। সে রামকে তুমি জান না। যে হরধনু তুমি তুলিতেও পার নাই, সেই হরধনু ভগ্ন করিয়া এই রাম সীতাদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছে। সে রামের সীতা হরণ করিবার চেষ্টা করিও না। যে রাম একাকী সেদিন এত সহস্র রাক্ষসকে নিধন করিয়াছে, তাহার ক্রোধোৎপাদন করিও না। তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, সাধ্বী সীতার দিকে লুব্ধদৃষ্টি করিও না। আমি বলিতেছি, সীতাকে হরণ করিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।" কিন্তু তাহার উপদেশে রাবণ কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, সে যদি তাঁহার আদেশ এখনই পালন না করে, তাহা হইলে তাহার মস্তক এখনই দেহ-চ্যুত হইবে। মারীচ বুঝিল, তাহার মরণ নিশ্চিত ; হয় রামের হস্তে, আর

না হয় রাবণের হস্তে তাহাকে মরিতেই হইবে। সে রাবণের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা রামের হস্তে মৃত্যুই অধিকতর প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিল ; সুতরাং সে রাবণের কার্য্য সাধনের জন্য গমন করিল। সেই সময়ে সীতাদেবী কুটীর-প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটি সুন্দর স্বর্ণবর্ণ মৃগ সেখানে খেলা করিতেছে। তাঁহার পালিত অনেক মৃগ আছে ; কিন্তু এরূপ সুন্দর মৃগ তিনি কখনও নয়নগোচর করেন নাই। ঐ মৃগটি ধরিয়া পালন করিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা কুটীর-প্রাঙ্গণে সমাগত হইলে, সীতা তাঁহাদিগকে ঐ সুন্দর মৃগটিকে দেখাইলেন এবং তাহা ধরিয়া দিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন। মৃগটি দর্শন করিবামাত্রই লক্ষ্মণের মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল। তিনি সে কথা রামকে বলিলেন। কিন্তু সীতার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া রাম বলিলেন যে, "ঐ মৃগ যদি প্রকৃতই মৃগ হয়, তাহা হইলে উহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিতেই পারিব। আর ও যদি মায়াবী রাক্ষসও হয়, তাহা হইলেও উহার বিনাশ সাধন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য ; কারণ সেদিন যে ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়াই অবস্থান করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে তিনি লক্ষ্মণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া গেলেন। জানকীকে

ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ যেন কোথাও গমন না করেন, এ উপদেশ তিনি পুনঃপুনঃ প্রদান করিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মৃগের পশ্চাৎ বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, মৃগটি ক্রমেই দূরবনে প্রবেশ করিতেছে, কিছুতেই তিনি তাহার সমীপস্থ হইতে পারিতেছেন না। তিনি এতক্ষণ মৃগটিকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সেই জন্যই এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় তিনি ধনুকে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। শরটি মৃগের শরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একটা রাক্ষস 'হা লক্ষ্মণ, হা সীতে' বলিয়া চীৎকার করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। রামচন্দ্র রাক্ষসের এই চীৎকার শুনিয়া বড়ই ভীত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক।

এদিকে রামের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া সীতা কত কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন; মৃগ-অন্বেষণের জন্য দুর্গম অরণ্যে প্রাণাধিক প্রিয়তমকে যাইতে দেওয়া ভাল হয় নাই মনে করিয়া তিনি কুণ্ঠিতা হইলেন। এমন সময়ে দূর বনে "হা লক্ষ্মণ, হা সীতে!" ধ্বনি হইল। তখন সীতাদেবী বুঝিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই কোন বিপদে পতিত হইয়া লক্ষ্মণ ও তাঁহার নাম করিয়া চীৎকার করিলেন। তিনি তখন স্বামীর জন্য অধীরা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সংজ্ঞা-লোপের সম্ভাবনা হইল। তিনি তখন লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যের জন্য

গমন করিতে বলিলেন এবং শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "দেবী! আপনি অস্থির হইবেন না। দাদার কোন বিপদ হইতেই পারে না। সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে এমন কেহ নাই যে, দাদাকে বিপন্ন করিতে পারে। তিনি এমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে পারেন না। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কোন মায়াবী রাক্ষস স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। আপনি যে চীৎকার শ্রবণ করিলেন, তাহা সেই রাক্ষসের স্বর। আপনি কোন ভয় করিবেন না। আপনাকে এই অরণ্যের মধ্যে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত হইবে না। আপনি দেখিতে পাইবেন, দাদা এখনই সুস্থ শরীরে কুটীরে আসিবেন।"

কিন্তু সীতাদেবী লক্ষ্মণের এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না; রামচন্দ্র বিপদে পতিত হইয়াই চীৎকার-পূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল। তখন তিনি আত্মহারা হইলেন, তাঁহার বিবেচনা-শক্তির লোপ হইল। যে সীতার ন্যায় সরলা ও মধুরভাষিণী জগতে দুর্লভ, আজ তিনি স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করিয়া পাগলিনীর মত হইলেন; তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিল না। লক্ষ্মণকে অবিচলিত দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহের আবির্ভাব হইল। তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল; তিনি মনে করিলেন

লক্ষ্মণ কোন কু-অভিসন্ধি সাধনের জন্যই এখনও নিশ্চিন্ত-ভাবে বসিয়া আছেন, রামের সাহায্যের জন্য যাইতেছেন না। তখন তিনি পাগলিনীর মত হইলেন। তিনি রোষভরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "নৃশংস, কুলাধম! তুই অতি কুকার্য্য করিতেছিস্; বোধ হয় রামের বিপদ তোর প্রীতিকর হইবে; এই নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে। তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতি-শত্রু। দুষ্ট, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখনই সফল হইবার নহে। এক্ষণে তোর সমক্ষেই আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, রাম বিনা ক্ষণকালের জন্যও আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিব না।"

সীতাদেবীর মুখ হইতে যে এমন কথা বহির্গত হইবে, ইহা কেহই কখন ভাবেন নাই। তিনি সত্যসত্যই আজ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন; নতুবা লক্ষ্মণের প্রতি কি তিনি এমন কুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। এতদিনের মধ্যে যাঁহার মুখে কখন সামান্য একটা রূঢ় কথাও শ্রবণ করেন নাই, তিনি যে আজ এমন পরুষভাষিণী হইলেন, ইহা তাঁহার অদৃষ্টের লিপি। তাঁহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ। যে লক্ষ্মণ রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত বনের কষ্ট অম্লানবদনে স্বীকার করিয়াছেন,

সেই লক্ষ্মণের উপর কু-অভিপ্রায়ের আরোপ করায় লক্ষ্মণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তাঁহার উপর সীতার সন্দেহ? এ কথা যে মস্তকে শত বজ্রপতন অপেক্ষাও ভয়ানক। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, আজ কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, নতুবা মাতৃস্বরূপিণী সীতার এমন বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিবে কেন? তিনি এমন হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইবেন কেন? তিনি সীতার হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "আর্য্যে, তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যের প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে। উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে, তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায়, একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতেছিলাম; কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপর নাই কটূক্তি করিলে। দেবি, তোমায় ধিক্; যেহেতু তুমি আমার উপর এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ। মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতে-ছিলাম; তুমি স্ত্রীসুলভ স্বভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়াই আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক। যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত

হইতেছে, ইহাতে বস্তুতঃই আমার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা হয়। এক্ষণে বনদেবতারা তোমায় রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।”

সীতাদেবী এ কথার কোন উত্তর করিলেন না; তিনি তখন স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন। লক্ষ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ মনে বনের মধ্যে চলিয়া গেলেন। সীতা একাকিনী কুটীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুরাত্মা রাবণ এতক্ষণ যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহা উপস্থিত দেখিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া, সীতার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি সীতার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন; তাঁহার মনে হইল, জগতের রূপরাশি একত্র করিয়াই যেন ভগবান সীতাকে নির্ম্মিত করিয়াছেন। তিনি তখন সীতাকে তাঁহার পরিচয় এবং ভীষণ অরণ্যে কোন্ সাহসে তিনি একাকিনী বাস করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুটীর-দ্বারে তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীকে সমাগত দেখিয়া সীতা তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং অতি সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাহার স্বামী ও দেবর এখনই প্রত্যাগত হইবেন; একটু অপেক্ষা করিলেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

রাবণের কি আর অপেক্ষা করিবার সময় আছে! তিনি

তখন আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং সীতাকে যে প্রকারে হউক তিনি লঙ্কায় লইয়া যাইবেন, এ অভিপ্রায়ও অম্লান-বদনে ব্যক্ত করিলেন। এই কথা শুনিয়া সীতার ভয় হইল না; এক অমানুষী শক্তিতে তিনি অনুপ্রাণিত হইলেন। তখন তাঁহার মূর্ত্তি সর্ব্ব-সংহারিণী হইল; সতীর তেজোমহিমায় ভূষিত হইয়া তিনি রোষভরে বলিলেন "রাক্ষস, তুই শৃগাল হইয়া সিংহীতে অভিলাষ করিতেছিস্? তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। তুই একটু অপেক্ষা কর, এখনই ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র বীর লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া তোর উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন।"

সীতার এই দুর্ব্বাক্য রাবণের অসহ্য হইল। এ দিকে যে কোন মুহূর্ত্তে রাম লক্ষ্মণও কুটীরে আসিতে পারেন। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন। সীতাদেবী সভয়ে দেখিলেন, এক মহাপরাক্রান্ত রাক্ষস তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন, বুঝিলেন, এই পাপাত্মার হস্তে আজ তাঁহার নিস্তার নাই। রাবণ তখন বলপূর্ব্বক বামহস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া কুটীর হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিতে দেখিতে একখানি রথ কুটীর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সীতাদেবী রাবণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

দুর্বৃত্ত রাবণ তাঁহাকে রথে তুলিয়া আকাশপথে রথ চালাইয়া দিলেন। সীতা ঘোর রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, বারংবার রামচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণকে ডাকিতে লাগিলেন, স্বর্গের দেবগণের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু আজ সকলেই নীরব; পতিপ্রাণা সীতার রক্ষার জন্য কেহই উপস্থিত হইলেন না। তিনি তখন শোকে কাতরা হইয়া স্থাবর জঙ্গমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জনস্থান, আজ তোমাকে নমস্কার করি; রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা রামকে শীঘ্র এই কথা বল। পুণ্যসলিলে গোদাবরি, তোমায় বন্দনা করি; রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া পলাইতেছে, তুমি রামকে এই কথা বল। অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি; রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা রামকে শীঘ্র এই কথা বল। এই স্থানে যে কোন জীব আছ, আমি সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি; রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা এই কথা শীঘ্র রামকে বল। যে যেখানে আছ, রামলক্ষ্মণকে এই কথা বল।"

জটায়ু নামে এক বিহগরাজ সেই বনপ্রান্তে বাস করিতেন। সহসা নারীকণ্ঠবিনিঃসৃত করুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া শূন্যপথে পলায়ন করিতেছেন। জটায়ু এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আর স্থির

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ।—৫৩ পৃষ্ঠা

থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ আকাশপথে উত্থিত হইয়া রাবণের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন ও রথ একেবারে বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। রাবণ তখন ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন; জটায়ুর প্রতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; বিহগরাজ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; রাবণ তখন তাঁহার পক্ষদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিলেন। মহাবীর জটায়ু মৃতপ্রায় হইলেন। রাবণ তখন সীতাকে আপনার পৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া আকাশ-পথে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার এবং পরিধেয় বস্ত্রেরও কিয়দংশ পথের মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই সকল চিহ্ন দেখিয়া রাম হয় ত তাঁহার সন্ধান করিতে পারিবেন। অনতিবিলম্বে সাগর অতিক্রম করিয়া রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

এদিকে বনের মধ্যে রাক্ষসকে 'হা লক্ষ্মণ! হা সীতে!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে শুনিয়াই রাম বুঝিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে বিপন্ন করিবার জন্যই রাক্ষসেরা এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার নিজের জন্য কোন ভয় হইল না; পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে। তাঁহার ভয় হইল যে, ঐ আর্ত্তনাদ শুনিয়া হয় ত লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী কুটীরে রাখিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইতে পারেন। কিন্তু আবার মনে করিলেন, বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ কি রাক্ষসের মায়া বুঝিতে পারিবেন না! তিনি তখন দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথেই লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "ভাই, সীতাকে একাকিনী ফেলিয়া আসা ত ভাল হয় নাই।" লক্ষ্মণ তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলে রাম আরও চিন্তিত হইলেন; তিনি বুঝিলেন, ঘোর বিপদ হইয়াছে, নতুবা সীতা লক্ষ্মণের প্রতি এমন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিবেন কেন এবং লক্ষ্মণই বা অভিমান-ভরে তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন কেন? তখন দুই ভ্রাতা শঙ্কিতহৃদয়ে দ্রুতপদে কুটীরের সমীপস্থ হইলেন।

তাঁহারা কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন সীতা নাই।

রাম তখন উচ্চৈঃস্বরে সীতাকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু কে উত্তর দিবে? তখন সীতাশোকে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ নানা প্রকারে তাঁহার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন, হয় ত সীতাদেবী বনের মধ্যে কোথাও ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, এখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তাঁহারা সমস্ত বন, নদীতীর, গিরিগুহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; একস্থানে দশবার গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। সীতার শোকে রামচন্দ্র উন্মত্তবৎ হইলেন।

তখন তাঁহারা পঞ্চবটীর সেই কুটীর ত্যাগ করিলেন। যেখানে এতদিন পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই স্থান ত্যাগ করিয়া দুই ভাই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; যাহাকে দেখেন, তাহাকেই সীতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারে না। তাঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, বিহগরাজ জটায়ু মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। রাম ও লক্ষ্মণ অনেক শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। তখন জটায়ু বলিলেন "রামচন্দ্র, তোমার সীতাকে রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া আমার এই দশা হইয়াছে।" তখন তিনি সমস্ত কথা বলিলেন। বাক্যশেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু

বহির্গত হইয়া গেল। রামলক্ষ্মণ জটায়ুর যথারীতি সৎকার করিয়া সীতার উদ্দেশে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালী রাজার ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যাত করিয়াছেন, এই জন্য সুগ্রীব অনুচরগণ সহ এই পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর হনূমান সুগ্রীবের প্রধান অনুচর ছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের নিকট তাঁহাদের দুঃখের কথা বলিলেন, তখন হনূমান বড়ই কাতর হইলেন এবং সীতা উদ্ধার বিষয়ে রামলক্ষ্মণের সহায়তা করিবার জন্য সুগ্রীবকে অনুরোধ করিলেন। সুগ্রীব বলিলেন, তিনি রাজ্য-তাড়িত, বনবাসী। রামচন্দ্র যদি তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রামচন্দ্রের সাহায্য করিতে পারেন। রামচন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তখন সুগ্রীব তাঁহার অল্পসংখ্যক বানরসৈন্য লইয়া মহাপরাক্রান্ত বালী রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণের অতুলনীয় রণ-কৌশলে বালী পরাজিত ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। সুগ্রীব সিংহাসন লাভ করিলেন। সিংহাসন-লাভের পর তিনি সীতা-অন্বেষণের জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, নানা কথায় কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে বীরবর

লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তখন সীতাদেবীর অন্বেষণের জন্য চারিদিকে বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং হনূমান দক্ষিণদিকে গমন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ইঁহাদের প্রত্যাগমন কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে সকলেই বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগত হইল, কেবল হনূমানেরই প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এ দিকে হনূমান নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া একেবারে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে এক পর্ব্বতের উপর সম্পাতি নামক বিহগরাজের সহিত হনূমানের সাক্ষাৎ হইল। সম্পাতি রাবণকে সীতাহরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে হনূমান্ শুনিলেন যে, রাবণ সীতাকে লঙ্কায় রাখিয়াছেন। তখন বানরগণ সকলেই সমুদ্র-পার হইয়া লঙ্কায় গমন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু সমুদ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই পার হইতে সাহসী হইল না। হনূমান্ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ছিলেন, বিশেষতঃ রামচন্দ্রের কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল; এমন কি এই কার্য্যে যদি তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বানর-দিগকে ভগ্নোৎসাহ হইতে দেখিয়া হনূমান্ সমুদ্র পার হইতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি তখন সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এক

পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তিনি সীতাকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিত পরাক্রম, অজেয় রাজ্য দর্শন করিয়া সীতাদেবী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু সীতাদেবীকে লঙ্কায় আনিয়া তিনি দেখিলেন, যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার প্রতাপ কিছুই সীতাদেবীকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তখন তিনি মনে করিলেন, আপাততঃ কিছুদিন সীতাকে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলিবেন না, বলপ্রয়োগ করিবেন না; ছলে কৌশলে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে আর তিনি বলপ্রয়োগ করিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি অশোকবনে সীতার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সীতাকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে এক বৎসর সময় দিলেন; এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি যদি রাবণের প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনরক্ষা হইবে না।

চেড়ীগণ-বেষ্টিতা হইয়া সীতাদেবী এই অশোকবনে দশমাস অতিবাহিত করিলেন। রামের বিরহে তিনি দিন দিন মলিন ও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। দিবানিশি কেবল তিনি রামনাম জপ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। দশমাস চলিয়া গেল; ইহার মধ্যে তিনি রামলক্ষ্মণের কোন সংবাদই

পাইলেন না। এক এক সময়ে তাঁহার মনে হইত, হয় ত রামলক্ষ্মণ আর ইহজগতে নাই, নতুবা এত দিনের মধ্যে কি তাঁহারা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিতেন না। আবার পরক্ষণেই মনে হইত, শীঘ্রই রামচন্দ্র তাঁহার উদ্ধারের জন্য সমাগত হইবেন; তিনি আবার তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা রামচন্দ্রের বদন দর্শন করিতে পারিবেন, আবার রামচন্দ্রের বক্ষে মস্তক রাখিয়া তিনি নারীজন্ম সার্থক করিবেন। এক এক সময়ে তাঁহার প্রাণত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু আশা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দিত না। দশ মাস অতীত হইয়াছে; এখনও দুই মাস আছে। কে বলিতে পারে, এই দুইমাসের মধ্যে রামচন্দ্র তাঁহার উদ্ধার করিবার জন্য লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন না। এই দুই মাসের মধ্যেও যদি রামচন্দ্র না আসেন, তাহা হইলে তখন প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত উপায় নাই। রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তখন তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প

এই সময়ে একদিন প্রভাত হইবার পূর্ব্বে সীতাদেবী দেখিলেন যে, অশোকবনের বৃক্ষগুলিতে যে সকল পক্ষী রাত্রিকালে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা কলরব করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ বনের মধ্যে কেহ সমাগত হইয়াছে, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? সীতাদেবী মনে করিলেন, হয় ত মায়াবী রাক্ষসগণ তাঁহার জন্য আবার

কি আয়োজন করিতেছে। ঐ নবাগত জীব আর কেহই নহেন, হনূমান্।

হনূমান্ ধীরে ধীরে সীতার অলক্ষিতে অথচ সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায় এমন একটি বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। হনূমান্ পূর্ব্বদিন লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং সমস্ত রাত্রি ছদ্মবেশে লঙ্কার ঘরে ঘরে সীতা-দেবীর অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু কোন স্থানেই এমন কোন রমণীকে দেখিতে পান নাই, যাহাকে সীতা বলিয়া তিনি মনে করিতে পারেন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে তিনি কখনও সীতাকে দর্শন করেন নাই, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণের নিকট সীতার বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহার সহিত কোন রমণীর আকৃতিই মিলিল না। এই প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রিশেষে হনূমান্ অশোকবনে প্রবেশ করিলেন এবং দূর হইতে দেখিলেন যে, একটী রমণী ধূলিশয্যায় আলুলায়িত-কেশে পতিতা রহিয়াছেন ; তাঁহার বদন মলিন, শরীর অস্থি-চর্ম্মসার ; কিন্তু তাহারই মধ্য হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। হনূমান্ বুঝিলেন, এই রমণীই সীতা। তবুও বিশেষ-ভাবে অবগত হইবার জন্য তিনি নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগ পাইলেন না, কারণ রাবণের আদেশ অনুসারে চেড়ীগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে, এমন কি রাত্রিকালেও দলে দলে চেড়ীরা তাঁহার প্রহরীর কার্য্য

করিয়া থাকে। হনূমান্ সেদিন আর সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইলেন না, বৃক্ষের মধ্যে লুকাইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি দেখিলেন যে, রাবণ বহুসংখ্যক সুন্দরী-পুরনারী-বেষ্টিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি জানকীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জানকি, তুমি আর কতদিন এমন ভাবে থাকিবে? তুমি এমন করিয়া আর ধরাতলে শয়ন, উপবাস ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিও না। আমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বিপুল রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমার মত ভুবনবিজয়ী আর কেহ এ পৃথিবীতে নাই। তপস্যা, বল, বিক্রম, ধন, জন, কিছুতেই সন্ন্যাসী রাম আমার সমকক্ষ নহে। আর তাহার ন্যায় সামান্য মানবের সাধ্যও নাই যে, এই দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া এখানে উপস্থিত হয়। আর এখানে উপস্থিত হইলেই বা কি! তাহার ন্যায় সহস্র সহস্র রামেরও সাধ্য নাই যে, আমার হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করে। এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিয়া তুমি মন স্থির কর।"

সীতাদেবী রাবণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রাক্ষস, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তুই আমাকে কিছুতেই এখানে রাখিতে পারিবি না। তুই এখনও বুঝিতে পারিস্ নাই যে, আমি কে? তোর ঐশ্বর্য্যে, তোর রাজত্বে আমি পদাঘাত করি। এখনও যদি ভাল চাস্, তাহা হইলে রামের

চরণে আমাকে ফিরাইয়া দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর্। রামচন্দ্র পরম ক্ষমাশীল; তোর এই মহাপাপও তিনি ক্ষমা করিবেন। নতুবা আমি বলিতেছি, তোর আর রক্ষা নাই। আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তোর মরণের দিন ক্রমেই নিকট হইতেছে; মহাবীর রামচন্দ্র তোর শাস্তি-বিধানের জন্য শীঘ্রই এখানে আসিবেন; তখন আর কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবি না। আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোর এই পুরী ধ্বংস হইয়া যাইবে।”

সীতার এই সকল কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন; চেড়ীগণও তখন রাবণের অনু-গমন করিল। সীতাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার এই সুন্দর সময় বুঝিয়া হনূমান্ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সীতা-দেবীর সম্মুখে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। সীতা প্রথমে মনে করিলেন, বুঝি কোন মায়াবী রাক্ষস বানরের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে; কিন্তু হনূমান্ যখন রাম-লক্ষ্মণ সম্বন্ধে সমস্ত কথা একে একে নিবেদন করিলেন এবং সীতাদেবীর প্রত্যয়ের জন্য রামপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সীতার হস্তে প্রদান করিলেন, তখন সীতার মনে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণ সম্বন্ধে কত কথা হনূমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হনূমান্ও সকল কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। অবশেষে হনূমান্ বলিলেন “মা, আপনি যদি

আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া এখনই এ স্থান ত্যাগ করি।" হনূমানের কথা শুনিয়া সীতা বলিলেন "বাছা,রামচন্দ্রের চরণ দর্শন করিবার জন্য আমি এতদূর ব্যগ্র হইয়াছি যে, তোমার প্রস্তাবে এখনই সম্মত হইতে ইচ্ছা হইতেছে। পরন্তু বাছা, তুমিই বল, আমার কি পরপুরুষ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য? যদিচ দুরাত্মা রাবণ আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল; কিন্তু তখন আমার কোন শক্তিই ছিল না। ইচ্ছা করিয়া আমি পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারিব না। তুমি রামচন্দ্রকে এই কথা বলিও,তিনি যেন স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান।"

সীতার এই কথা শুনিয়া হনূমানের মনে অতিশয় ভক্তির উদয় হইল; তিনি বুঝিলেন যে, সীতার ন্যায় পতি-পরায়ণা—সাধ্বী ভূমণ্ডলে আর নাই। হনূমান্ তখন সীতাদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন,অনর্থক সময় নষ্ট করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। যত শীঘ্র সীতার সংবাদ রামকে দিতে পারেন, ততই ভাল মনে করিয়া হনূমান্ সেই দিনেই লঙ্কাত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। রামের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য সীতাদেবী আপনার মস্তক হইতে একটী চূড়ামণি উন্মোচন করিয়া হনূমানের হস্তে দিলেন। হনূমান্ এই অভিজ্ঞান লইয়া অশোকবন হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে, এতদূরে আসিয়া রাবণের শক্তিপরীক্ষা না করিয়াই চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না! তখন তিনি অশোকবন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বনভঙ্গের সংবাদ পাইয়া রাক্ষসগণ দলে দলে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অশোকবনে উপস্থিত হইল। হনূমান্ সকলকেই পরাজিত করিলেন। শেষে তিনি মনে করিলেন যে, একবার রাবণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভাল হয়। এই সময়ে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ তাঁহার দমন করিবার জন্য উপস্থিত হইল। হনূমান্ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। তখন রাক্ষসগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাবণ-সম্মুখে উপস্থিত করিল। হনূমান্ রাবণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাকে রামের দূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিপন্মুক্ত হইবার জন্য রাবণকে উপদেশ দান করিলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া হনূমানের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মপ্রাণ বিভীষণ ও পারিষদ্‌গণ বলিলেন যে, দূত অবধ্য; তাহাকে বধ করিতে নাই। রাবণ তখন হনূমানকে বিকৃতাঙ্গ করিয়া তাড়াইয়া দিবার আদেশ দিলেন। রাক্ষসগণ হনূমানের লাঙ্গুলে তৈলসিক্ত বস্ত্র জড়াইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করতঃ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে হনূমান্ এক লম্ফে একখানি গৃহের চূড়ায় উপবিষ্ট হইলেন। সেই গৃহে যেই অগ্নি-সংযোগ হইল, তখন তিনি গৃহান্তরে গমন করিলেন। ইহাতে লঙ্কার অনেক গৃহ জ্বলিয়া উঠিল; চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল; দেখিতে দেখিতে সুন্দর সুন্দর গৃহগুলি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। হনূমান্ তখন অশোকবনে গমনপূর্ব্বক সীতাদেবীকে

প্রণাম করিয়া রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং অনতিবিলম্বে রাম-লক্ষ্মণসমীপে উপস্থিত হইয়া সীতার প্রদত্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। তখন রাবণ-বধের জন্য সৈন্যসমাবেশ হইতে লাগিল। বানর-সৈন্য সমুদ্রতীরে সমবেত হইল। সাগর-বন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। রামচন্দ্রের অনুগত বানর-সৈন্যগণ সমুদ্র-বন্ধন আরম্ভ করিল। নানাস্থান হইতে বৃক্ষপ্রস্তর সকল সংগ্রহ করা হইতে লাগিল; বানরগণ মহা-উৎসাহে সাগর-বন্ধন করিতে লাগিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ অগণিত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রের অপর তীরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সমুদ্রবন্ধন আরম্ভ হইয়াছে, এ সংবাদ লঙ্কায় পোঁছিলে সকলেই চিন্তিত হইলেন। বানর-গণ যে কেমন সাহসী, তাহা রাক্ষসদিগের জানিতে বাকী ছিল না; হনূমান্ একাকী লঙ্কার কি দুরবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ ভুলিতে পারে নাই। সুতরাং রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগ-মনের সংবাদ পাইয়া সকলেই কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য রাজ-সভায় সমবেত হইলেন। রাবণ তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে বলি-লেন "মহারাজ, রামচন্দ্রকে সামান্য শত্রু মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না। সীতাদেবীকেও সামান্যা মানবী মনে করিবেন না। যে রামচন্দ্র একাকী খর ও দূষণকে নিধন করিয়াছেন, যে রামচন্দ্র মহাবীর বালীকে বধ করিয়াছেন, যে রামচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়াও প্রবল বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া সমুদ্রের অপর তীরে উপস্থিত হইয়াছেন, যে রামচন্দ্রের আদেশে

সমুদ্রবন্ধন আরম্ভ হইয়াছে এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই শেষ হইবে, সে রামচন্দ্রের সহিত শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। অতএব আমাদের নিবেদন, আপনি সীতাকে রামের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হউন; ঘোর অনিষ্টপাত হইতে লঙ্কাকে রক্ষা করুন।”

রাবণ ধীরভবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “এ পৃথিবীতে আমি কখনও কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করি নাই। সামান্য মানবের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গের দেবগণও আমার ভয়ে কম্পিত-কলেবর; আমি কি ভিখারী রামের ভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিব? আমি কি প্রাকৃত জনের মত একটা মানুষের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিব? তাহা কিছুতেই হইবে না। তোমরা আশ্বস্ত হও; আমি দেখিতে দেখিতে বানরসৈন্য সহ রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিব।”

তখন বিভীষণ বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, “মহারাজ, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পরমপূজনীয়—গুরুজন। আপনি আমার অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। . আপনাকে কোন কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি স্থিরচিত্তে সমস্ত কথা চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। আপনি উপস্থিত ব্যাপারকে সামান্য মনে করিবেন না। আপনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিবেন না। এখনও আত্মীয় বন্ধুগণের সৎপরামর্শ

গ্রহণ করুন। আপনার বিবেচনার ক্রটীতে এই সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়া যাইবে; আমরা সবংশে নিহত হইব। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ হইবেন না। এখনও সময় আছে; রামচন্দ্রের হস্তে সীতাদেবীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন, নতুবা সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত।”

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; বিভীষণের প্রতি নানা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, “তোর যদি এত ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুই এ রাজপুরী হইতে চলিয়া যা; সেই ভিখারী রামের দাসত্বে জীবন অতিবাহিত কর্।”

বিভীষণ বলিলেন “পতন-সময়ে সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে; আপনারও তাহাই হইয়াছে। আপনার দোষেই এই সোণার লঙ্কা ছারখারে যাইবে। আপনার বংশে বাতি দিবার জন্য কেহ রহিবে না।”

এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে আত্মহারা হইলেন এবং বিভীষণকে পদাঘাত করিয়া রাজসভা হইতে দূর করিয়া দিলেন। বিভীষণ তখন সমুদ্র পার হইয়া রামের শরণাগত হইলেন এবং সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণের ন্যায় মিত্র লাভ করিয়া বুঝিলেন যে, ভগবান্ তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার অদৃষ্টে এমন পরম-উপকারী মিত্রলাভ হইবে কেন? বিভীষণ যেমন

রামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী সরমা ও কন্যা কলা পূর্ব্ব হইতেই সীতাদেবীর প্রতি তেমনই অনুরক্তা হইয়াছিলেন। এই রক্ষঃপুরে সরমা সীতার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। সীতা যখন রামচন্দ্রের শোকে অধীরা হইতেন, তখন সরমাই নানা প্রকার আশা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন; রাবণ যখন সীতার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তখন সরমা তাঁহার দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। সরমা যখন অবকাশ পাইতেন, তখনই সীতার নিকট আগমন করিতেন এবং নানা গল্প করিয়া সীতার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসীও সীতার মধুর ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিল। রাবণ এই ত্রিজটার উপরই সীতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিজটা যথাসাধ্য সীতার সেবা করিত, কোন দিন সে কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার বা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে নাই। সরমা ও ত্রিজটা যখন যে সংবাদ পাইত, তাহাই তৎক্ষণাৎ সীতার গোচর করিত। সীতা যখন সরমার মুখে বিভীষণের অপমান ও তাঁহার রামের শরণাপন্ন হইবার কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল; তিনি মনে ভাবিলেন যে, এতদিনে তাঁহার উদ্ধারের পথ হইল এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে অনেক বিপদ হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

এদিকে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সাগরবন্ধন শেষ হইল। সৈন্যগণ লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র রাজোচিত নিয়ম অনুসারে বালীর পুত্র অঙ্গদকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ অথবা যুদ্ধ এই দুইয়ের অন্যতর প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য রাবণকে বলিলেন। রাবণ সীতাকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না; যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দূতকে বিদায় প্রদান করিলেন। অঙ্গদ রামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। তখন চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। বানরসৈন্যের কোলাহলে লঙ্কা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। লঙ্কার অধিবাসিবৃন্দ বুঝিল যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য, রাবণের ধ্বংস কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

মহারাজ রাবণ তখন পাত্রমিত্র সভাসদ লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। বহু বাদানুবাদের পর এই স্থির হইল যে, মায়াবলে রামের ছিন্নমুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই মুণ্ড ও শরাসন সীতাকে দেখাইলে সীতা রামের আশা পরিত্যাগ করিয়া রাবণকে আত্মসমর্পণ করিবে; এবং এই সংবাদ রামের কর্ণগোচর হইলে, হয় তিনি মনের দুঃখে প্রাণ-ত্যাগ করিবেন, অথবা অসতীর উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া লঙ্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। তাহা হইলে বিনা যুদ্ধেই রাবণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অমাত্যগণ ইহাতে

সম্মতি প্রদান করিলে রাবণ স্বয়ং রামের ছিন্নমুণ্ড ও শরাসন লইয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ঐ মুণ্ড ও শরাসন দেখাইলেন। সীতা ঐ মায়ামুণ্ডকেই রামের প্রকৃত মুণ্ড মনে করিয়া স্বামীশোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরে চেতনালাভ করিয়া পাগলিনীর ন্যায় রাবণকে বলিলেন "ওরে দুরাশয়, তুই কি করিয়াছিস্! তুই সত্যসত্যই এত-দিনে আমাকে অনাথা করিলি! আমি তোকে অভিশাপ দিব না। তুই যে কার্য্য করিয়াছিস্, তাহার ফল তোকে ভোগ করিতে হইবে! তুই কি মনে করিয়াছিস্ আমি এখন তোর হস্তে আত্মসর্পণ করিব? সে কথা তুই মনেও স্থান দিস্ না। আমি এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইব।" রাবণ যাহা মনে করিয়া এই মিথ্যা ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা সফল হইল না দেখিয়া, সেই দিনই সীতার প্রাণবধ করিবেন বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সীতাদেবী স্বামীশোকে অধীরা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

রাবণ চলিয়া গেলে, সরমা দ্রুতগতি সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে নিতান্ত শোকাকুলা দেখিয়া বলিলেন "দেবি, আপনি এতদিন এই রাক্ষসপুরে বাস করিয়াও এখানকার মায়ার খেলা বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি কি জন্য শোক করিতেছেন? পৃথিবীতে এমন কে আছে যে রামচন্দ্রের প্রাণবধ করিতে পারে? রাক্ষসরাজ আপনাকে

ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার জন্য মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করাইয়াছেন। দেবি, ঐ শুনুন বানর-শিবির হইতে জয়ধ্বনি হইতেছে, বানর-সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা শুনিয়াও কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, রামচন্দ্রের কোন অমঙ্গল হয় নাই ? আপনি আশ্বস্তা হউন।” সরমার কথা শুনিয়া সীতাদেবী আশ্বস্তা হইলেন, তাঁহার ভ্রম দূর হইল।

রাবণ দেখিলেন, যুদ্ধ ব্যতীত উপায় নাই। তখন রাক্ষস-সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। বড় বড় রাক্ষস-বীর যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার পরই লঙ্কাকাণ্ড আরব্ধ হইল,—প্রতিদিন ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসের রক্তে নদী বহিতে লাগিল, রণস্থল মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। রাক্ষস-পক্ষের যিনি যুদ্ধে গমন করেন, তিনি আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারেন না ; কেবল রাবণ ও তাঁহার বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ কখনও বা পরাজিত হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করেন, কখনও বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করেন। একদিন ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন ; কিন্তু বানরগণের চেষ্টায় তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

রাক্ষসদিগের মধ্যে যত বড় বড় বীর ছিলেন, একে একে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন ; কুম্ভ, নিকুম্ভ, অতিকায়, মকরাক্ষ, বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবীর সকল এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাবণ তখন বুঝিতে

পারিলেন যে, এ কালসমরে কাহারও পরিত্রাণ নাই ; রাবণ-বংশ ধ্বংস করিবার জন্যই তিনি কুক্ষণে সীতাদেবীকে লঙ্কায় আনিয়াছেন। কিন্তু এখন অনুশোচনা বৃথা ; তিনি নিজের বুদ্ধির দোষে, প্রবৃত্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া যে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতেই হইবে। এখন আর রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সময় নাই ; এখন এই মহাসমরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

এদিকে বানর-সৈন্য দেখিল যে, সকলের সহিতই যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইতেছে, কেবল ইন্দ্রজিতের সহিতই তাহারা হারিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রজিৎ শত্রুবিজয়ী হইবার জন্য লঙ্কার মধ্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই যজ্ঞে আহুতি প্রদানের পর তিনি যেদিন সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবেন, সেদিন কাহারও সাধ্য হইবে না যে তাঁহাকে পরাজিত করে। এই সংবাদ অবগত হইয়া একদিন গোপন-ভাবে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ তখন যজ্ঞকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে যে লক্ষ্মণ বা বিভীষণ প্রবেশ করিতে পারিবেন, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার নিকট তখন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। এই অসহায় অবস্থায় লক্ষ্মণকে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলেন ; নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ যতক্ষণ পারিলেন, ততক্ষণ

একাকী বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে সেই যজ্ঞাগারেই তাঁহার দেহাবসান হইল; লঙ্কার একমাত্র অবলম্বন ইন্দ্রবিজয়ী মহাবীর মেঘনাদ এতদিন পরে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইলেন।

মেঘনাদবধের সংবাদ পাইয়া রাবণ ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, লক্ষ্মণের রক্তে তিনি আজ পুত্রশোক নির্ব্বাপিত করিবেন। সৈন্য সকল দলে দলে সজ্জিত হইল; বড় বড় সেনাপতি আজ রাবণের অনুগমন করিল। এ দিনে যে ভয়ানক যুদ্ধ হইল, তাহার তুলনা হয় না। এই যুদ্ধে রাবণ-নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে লক্ষ্মণ ধরাশায়ী হইলেন। রাক্ষসদল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। বানর-শিবিরে হাহাকার উপস্থিত হইল; রামচন্দ্র লক্ষ্মণের শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বানরদলের মধ্যে সুষেণ চিকিৎসা-বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই রাত্রির মধ্যে কেহ যদি বিশল্যকরণী লতা আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি ঠাকুর লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা করিতে পারি।" বিশল্যকরণী যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না; বহুদূরে গন্ধমাদন পর্ব্বতে সেই লতা পাওয়া যায়। কাহার সাধ্য যে এই রাত্রির মধ্যে সেই লতা লইয়া আসে! যাহা সকলের অসাধ্য, তাহা প্রভুভক্ত হনূমানের সাধ্য। হনূমান্ বলিলেন, "আমি গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী আনিব।" পবননন্দন তখন

পবনবেগে গন্ধমাদন পর্ব্বতের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে সেই লতা তাঁহার অপরিচিত। হনূমান্ তখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে যে সমস্ত লতা দেখিলেন, গাছ-পাথর শুদ্ধ তৎসমস্ত লইয়া রাত্রির মধ্যেই লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্যরাজ তখন তাহারই মধ্য হইতে বিশল্যকরণী বাছিয়া বাহির করিলেন এবং তাহার রসের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ সংজ্ঞালাভ করিলেন; বানর-সৈন্যমধ্যে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। রাবণ এই জয়ধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন যে, শক্তিশেলে মৃত লক্ষ্মণ পুনরায় জীবিত হইয়াছেন। তখন তিনি বুঝিলেন, এ সংগ্রামে আর তাঁহার নিস্তার নাই।

এইবার শেষ যুদ্ধ। এ ভয়ানক যুদ্ধের বর্ণনা করা অসম্ভব। রাবণ আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, হয় রামচন্দ্র আজ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, আর না হয় তিনিই প্রাণত্যাগ করিবেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম ও রাবণ উভয়েই যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশারদ। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রাবণ জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হইল। তখন সকলে দেখিল

"এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি;
এক জন নাই তার বংশে দিতে বাতি।"

সপ্তম অধ্যায়

লঙ্কার অধিপতি রাবণ কুকর্ম্মের ফল পাইলেন। বানরগণ জয়োল্লাসে মগ্ন হইল। তখন রামচন্দ্র হনূমানকে বলিলেন, "বৎস, এই লঙ্কাবিজয়ে তুমিই আমার প্রধান সহায়। তুমিই প্রথমে আমাকে সীতার সংবাদ প্রদান করিয়াছিলে। তোমারই বীরত্বে ও তোমারই দয়ায় আমি প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ফিরাইয়া পাইয়াছি। এই বানরসৈন্যদলের মধ্যে তুমিই একমাত্র সীতার পরিচিত। অতএব তুমিই অদ্য রাবণ-বধের সংবাদ সর্ব্বাগ্রে সীতাকে প্রদান করিবার জন্য গমন কর।" হনূমান্ এই আদেশেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল, ছুটিয়া যাইয়া এই সংবাদ সীতাদেবীকে প্রদান করিয়া আসেন। কিন্তু তিনি রামের দাস ; প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়াই তিনি সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন ; এখন প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাঁহার অশোকবনে গমন কর্ত্তব্য নহে, মনে করিয়াই তিনি এতক্ষণ নিরস্ত ছিলেন। এক্ষণে রামের আদেশ শ্রবণমাত্রই তিনি হৃস্টচিত্তে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। আজ আর তাঁহার ভয় নাই, আজ আর তাঁহার সঙ্কোচ নাই। আজ যে সংবাদ লইয়া তিনি জানকীর নিকট গমন করিতেছেন, তেমন সংবাদবহনের ভার তাঁহার উপর কেহ কখন প্রদান করে নাই।

হনূমান্ বায়ুগতিতে সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণ-বধের সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্র যে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও নিবেদন করিলেন। সীতাদেবী হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে হনূমানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, আজ তুমি আমাকে যে সংবাদ প্রদান করিলে, তাহার জন্য সসাগরা ধরার অধীশ্বরত্ব তোমাকে প্রদান করিবার শক্তি যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে তাহাও প্রদান করিলে আমার আশা মিটিত না। বৎস, তোমার এ সংবাদের প্রতিদান নাই। অশোকবন-বাসিনী চিরদুঃখিনী সীতা আজ তোমাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে।"

হনূমান্ বলিলেন, "মা, ইহার অধিক পুরস্কার এ জগতে কি আছে, তাহা ত আমি জানি না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন কায়মনোবাক্যে তোমাদের চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি!" তাহার পর হনূমান্ বলিলেন, "মা, আমার একটী প্রার্থনা আছে। যে সমস্ত রাক্ষসী এতদিন তোমাকে নানা কষ্ট দিয়াছে, আমি তাহাদের শাস্তিবিধান করিতে চাই।" হনূমানের এই প্রার্থনা শুনিয়া সীতাদেবী বলিলেন, "বৎস, যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব্ব দুষ্কৃতি-নিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিয়াছি। বলিতে কি, আমি

স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিয়াছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটী দৈব গতি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যপকার করেন না। ধরিতে গেলে, সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত।”

সীতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হনূমান্ বলিলেন “মা, আমি অল্পবুদ্ধি; না বুঝিয়া একটা কথা বলিয়াছি, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া আপনার কুশল নিবেদন করি এবং অদ্যই আপনাকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করি।”

সীতাদেবী বলিলে, “বৎস, তুমি প্রভুর চরণে আমার প্রণাম এবং লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বীরগণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। প্রভুকে বলিও, তাঁহার চরণ দর্শন করিবার জন্য আমার এমন ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে যে, আমার অণুমাত্র বিলম্ব সহিতেছে না।”

হনূমান্ তখন সীতাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া অশোকবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সীতাদেবীর কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। সীতাদেবী যে রামের শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য বিশেষ

উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, হনূমান্ সে কথাও বলিলেন। রামচন্দ্র হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "বন্ধু বিভীষণ, সীতাকে এই স্থানে আনয়ন করিবার জন্য তোমাকেই অশোককাননে গমন করিতে হইতেছে। তুমি তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস।" এই কথা বলিয়াই রামচন্দ্র পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। কেহই রামচন্দ্রের এ প্রকার ভাবান্তরের কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না।

বিভীষণ তখন অশোককাননে গমন পূর্ব্বক সীতাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রামচন্দ্রের আদেশ ব্যক্ত করিলেন। সীতাদেবী হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে শিবিকারোহণে স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। শিবিকা রাম-শিবিরে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র সীতাকে শিবিকার বাহিরে আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রামের এই অনুরোধ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যে রাজসভায় সকলে উপস্থিত রহিয়াছেন, সেখানে সীতাকে সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইবার অনুজ্ঞা-শ্রবণে কেহই রামচন্দ্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। পতিপ্রাণা সীতা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া রামের চরণ-বন্দনা করিলেন। রাম এতদিন পরে সীতাকে দেখিয়া কোথায় আনন্দে অধীর হইবেন এবং তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি স্থিরভাবে আসনেই উপবিষ্ট রহিলেন। সকলেই অবাক্ হইয়া রামের দিকে চাহিয়া

তোমার কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য নহে! রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী কৃপা-ভিখারিণী নহে। কিন্তু হে আমার ভূদেব! হে কলঙ্কভঞ্জন! তুমি এই জনসঙ্ঘের সম্মুখে সীতাকে কলঙ্কিনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছ। আমি এ কলঙ্ককালি অঙ্গে মাখিয়া মরিতে প্রস্তুত নহি। বৎস লক্ষ্মণ, তোমাকে একদিন দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলাম; তাহার জন্য এই এক বৎসর যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এখনও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই। বৎস, তুমি চিতা প্রস্তুত কর। যদি আমি অসতী হই, যদি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য কখন রামনাম বিস্মৃত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এ কলঙ্কিত দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আর যদি আমি সতী হই, যদি আমি রামগতপ্রাণা হই, তাহা হইলে অগ্নি আমার কিছুই করিতে পারিবে না। তাহার পর আমি রাজাদেশ অবনতমস্তকে পালন করিব।"

সীতার এই নিদারুণ আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে রামচন্দ্রের দিকে চাহিলেন; রামচন্দ্র তখন তাঁহাকে সতীর আদেশ পালন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং স্থিরভাবে বসিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া রামের এই অটল গাম্ভীর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন; কাহারও সাহস হইল না যে, রামচন্দ্রকে একটী কথা বলেন।

চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা তখন গললগ্নীকৃতবাসে

অগ্নিদেব-কর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে সীতা পুনঃ প্রদান।—৮৩ পৃষ্ঠা

রামচন্দ্রের চরণে প্রণামপূর্ব্বক চিতা প্রদক্ষিণ করিবার কালে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

"মনসি বচসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং।
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী॥"

তাহার পর তিনি নির্ভয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; সকলে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র নিঃস্পন্দনয়নে সীতার এই অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিলেন ; তাঁহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। এমন সময়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব জানকীকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক চিতা হইতে বাহির হইলেন। সকলে তখন জয়ধ্বনি করিল, সকলের হৃদয় তখন মহানন্দে পূর্ণ হইল। অগ্নিদেব সীতাকে লইয়া রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "রাম, এই তোমার সীতা। ইনি নিষ্পাপা। তুমি ইঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ কর। আমি তোমাকে বলিতেছি, সীতাদেবী এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার চিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি সতীকুলশিরোমণি। তুমি ইঁহার চরিত্রে অণুমাত্রও সন্দেহ করিও না। আজ ইনি যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন, এ জগতে কেহ কখন এমন ভীষণ পরীক্ষা প্রদানের জন্য অগ্রসর হয় নাই।" এই বলিয়া অগ্নিদেব অন্তর্হিত হইলেন।

রামচন্দ্র তখন সীতার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন “সাধ্বি, এ কার্য্য তোমারই উপযুক্ত, ইহা তোমাতেই সম্ভবে। আজ তুমি পৃথিবীর সম্মুখে যে দৃষ্টান্ত দেখাইলে, যতদিন পৃথিবীতে মানবজাতি থাকিবে, ততদিন তোমার এই মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। তোমারই সতীমাহাত্ম্য জগৎকে দেখাইবার জন্য দেবগণ তোমার এই পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দেবি, আমি এ ব্যাপারে নিমিত্তমাত্র।” এই বলিয়া রামচন্দ্র সীতার করধারণ করিলেন। পতিপ্রাণা সীতা তখন সমস্ত অপমান, সমস্ত কঠোর বচন ভুলিয়া গেলেন; তাঁহার হৃদয় তখন অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি রামচন্দ্রের পদধূলি মস্তকে লইলেন। রাম-জানকীর এই অপূর্ব্ব মিলন দর্শনে সকলে পুনরায় জয়ধ্বনি করিলেন; স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তাহার পর শুভদিনে বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বানর ও রাক্ষস-সৈন্য সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র অযোধ্যা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসকাল শেষ হইয়া গিয়াছিল। রামচন্দ্র দেশে আগমন করিতেছেন শুনিয়া অযোধ্যায় আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। ভরত কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রের চরণ-বন্দনা করিলেন। রামচন্দ্র তখন সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান্ ও অন্যান্য বীরগণের সহিত ভরতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বিমাতা কেকয়ীর কক্ষে গমন করিলেন। রাণী কেকয়ী এতকাল জীবন্মৃতার ন্যায় কালযাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে রামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পরম স্নেহভরে কোলে লইলেন; রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া মাতা কৌসল্যা ও সুমিত্রার নিকট গমন করিলেন। এতদিন পরে আযোধ্যা নগরী আবার আনন্দময় হইল। তাহার পর শুভদিনে রামচন্দ্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অযোধ্যার নরনারীগণ মহোৎসবে মগ্ন হইল।

অষ্টম অধ্যায়

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজপদ গ্রহণ করিয়া যে ভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাঁহার শাসনগুণে সমস্ত রাজ্য সুখ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল। পৃথিবীতে আর কখনও কাহারও রাজত্বসময়ে প্রজাগণ এমন সুখে কালযাপন করে নাই; সেই জন্য সুশাসনের তুলনা প্রদান করিতে হইলে লোকে এখনও বলে "এটা রামরাজ্য।" সুশাসন এবং প্রজারঞ্জনই রামচন্দ্রের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন-তখনই বলিতেন "প্রজা-রঞ্জনের উদ্দেশ্যে আমি সকলই করিতে পারি; এমন কি, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে প্রাণাধিক-প্রিয়তমা সীতাকে পর্য্যন্ত অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে পারি।" কিন্তু হায়! রামচন্দ্র কি তখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই বাক্য একদিন সফল হইবে; একদিন সত্যসত্যই প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রাণাধিকা সীতাকেও বনে বিসর্জ্জন দিতে হইবে!

এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে সকলেই অবগত হইলেন যে, সীতাদেবী প্রজাবতী হইয়াছেন। পৌর এবং জানপদগণ এ সংবাদে মহা-আনন্দিত হইলেন। রামচন্দ্র সত্বরেই পুত্রমুখ

নিরীক্ষণ করিয়া জন্ম সার্থক করুন, সকলেই ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; পুরবাসিনীগণ সর্ব্বদা সীতাদেবীর চিত্তবিনোদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সীতা এখন অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যখন যাহা বাসনা হইত, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইত। রামচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই সীতার মন্দিরে সমাগত হইতেন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে দোহদলক্ষণাক্রান্ত সীতার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন।

একদিন কথোপকথনচ্ছলে রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এখন কি ইচ্ছা হয়, আমাকে বলিতে পার ?" সীতাদেবী বলিলেন "প্রভু, আমার এক এক সময়ে ইচ্ছা হয় যে, মুনি-ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিয়া বনের শোভা দর্শন করি এবং ঋষিপত্নীগণের সহিত কথোপকথন করিয়া আনন্দলাভ করি।' রামচন্দ্র সীতাদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে বলিলেন "ইহা ত আর কঠিন কথা নহে। তোমার এ বাসনা আমি অপূর্ণ রাখিব না। আমি অদ্যই ব্যবস্থা করিতেছি। আগামী কল্য তুমি তমসাতীরে বাল্মীকি মুনির তপোবন দর্শনে গমন করিও। রাজকার্য্যের অনুরোধে হয় ত আমি তোমার সঙ্গী নাও হইতে পারি ; প্রাণাধিক লক্ষ্মণ তোমাকে সঙ্গে লইয়া বনপর্য্যটন করিয়া আসিবেন।" রামের কথা শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী বড়ই আনন্দিতা হইলেন এবং ঋষিপত্নীগণের উপঢৌকনাদি যোগ্য

দ্রব্যসম্ভারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রজাগণের অভিপ্রায় জানিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের মনের ভাব ও অভাব অভিযোগ রামচন্দ্রের গোচর করিত। পূর্ব্বোক্ত দিনে সীতার মন্দির হইতে বাহির হইয়াই রামচন্দ্র শুনিলেন যে, দুর্ম্মুখ নামক গুপ্তচর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রামচন্দ্র প্রতিহারীকে বলিলেন, "সত্বর দুর্ম্মুখকে আমার সমীপে লইয়া আইস।" দুর্ম্মুখ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন "দুর্ম্মুখ, আজ কি সংবাদ আনয়ন করিয়াছ?" দুর্ম্মুখ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল "রাজন্, দেশের সকলেই এক-বাক্যে বলে যে, তাহারা রামরাজ্যে পরম সুখে বাস করিতেছে।" রামচন্দ্র বলিলেন, "দুর্ম্মুখ, তুমি প্রতিদিন ঐ একই কথা বলিয়া থাক। প্রশংসাবাক্য শ্রবণের জন্য আমি তোমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করি নাই। যদি কেহ আমার কোন দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তবে তাহাই বল, আমি তাহার প্রতীকারে তৎপর হই।" রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুর্ম্মুখের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, কি দুর্দ্দৈব, মহারাজ আজ এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সে তখন অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া বলিল,

"মহারাজ, কেহ ত আপনার কোন দোষ কীর্ত্তন করে না।" দুর্ম্মুখ যে ভাবে এই কথা বলিল, তাহাতে রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহের সঞ্চার হইল ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুর্ম্মুখ কোন কথা গোপন করিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, "দুর্ম্মুখ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন কথা গোপন করিতেছ। তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সত্য কথা বল। তোমার বাক্য ভীষণ মর্ম্মভেদী হইলেও, আমি তোমার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। বরঞ্চ তুমি যদি সত্য গোপন কর, তাহা হইলেই আমি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইব।" দুর্ম্মুখ দেখিল, কথা গোপন রাখিবার চেষ্টা বৃথা হইয়াছে ; তাহার মুখের ভাব দর্শনেই রামচন্দ্র সে কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। তখন সে কাতরবচনে বলিল, "মহারাজ, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, কি ভীষণ কার্য্যভারই আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই মুহূর্ত্তে যদি আমার জীবনান্ত হইত, তাহা হইলে এই অপ্রীতিকর কথা মহারাজের গোচর করিবার দায় হইতে আমি অব্যাহতি লাভ করিতাম।" দুর্ম্মুখের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন ; তিনি বলিলেন, "দুর্ম্মুখ, তুমি আর বিলম্ব করিও না। এখনই তোমার বক্তব্য শেষ করিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর কর।"

দুর্ম্মুখ তখন বলিল, "মহারাজ, পুনরায় বলিতেছি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ, সকলেই একবাক্যে

আপনার সুশাসনের প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ রাজমহিষীর কথা উল্লেখ করিয়া নানা কথা বলিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, 'রাজার মনে কোন বিকার নাই। রাজার মহিষী এতদিন রাবণগৃহে একাকিনী বাস করিলেন, আর মহারাজ তাহাতে কোন প্রকার সংশয় না ভাবিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর যদি প্রজাদিগের গৃহে এই প্রকার অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে অপরাধিনী নারীদিগের শাসন করা অসম্ভব হইবে। তাহারা রাজমহিষীর কথা উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবে।' তাহারা আরও বলে যে, 'আমরা আর কি করিব ; রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা ; তিনি যাহা করিবেন—আমরা আশ্রিত প্রজা—আমরাও তাহাই করিব ; তিনি যে ব্যবস্থা প্রচলন করিবেন, আমাদিগকে তদনুসারেই চলিতে হইবে।' মহারাজ, আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, নিবেদন করিলাম। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। হায় ভগবান্! এতদিনে আমার দুর্ম্মুখ নাম যথার্থ হইল।" এই বলিয়া দুর্ম্মুখ ক্রন্দন করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

দুর্ম্মুখ নিষ্ক্রান্ত হইলে রামচন্দ্র আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না ; তাঁহার শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল ; নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ে তখন যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। রামচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ মৃতবৎ থাকিয়া নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন, "আর চিন্তা করিয়া লাভ কি? প্রজাপালন

ও প্রজারঞ্জনের ভার যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন ত আর স্বকীয় সুখ দুঃখের চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। আমার হৃদয়ে বিষম শেলাঘাত হইলেও আমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে। কিন্তু হায়, চিরজীবন দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই কি আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম! আর সেই অভাগী জনকনন্দিনী! তাহার কথা মনে হইলে যে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। ভগবান্ কি তাহার অদৃষ্টে সুখভোগ লেখেন নাই? রাবণগৃহে এতকাল অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিয়া সে মনে করিয়াছিল বুঝি বা তাহার দুঃখের দিন কাটিয়া গিয়াছে; জীবনের অবশিষ্ট কাল সে মনের সুখে অতিবাহিত করিবে। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে যে এই ঘোর দুর্দ্দশা লিখিত আছে, তাহা ত সে একদিনও ভাবে নাই। এখন ত উপায়ান্তর নাই। সীতাকে চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, তাহাকে পতিপ্রাণা জানিয়াও আমাকে এই কার্য্য করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া রামচন্দ্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে সেস্থানে আনিবার জন্য প্রতিহারীকে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা আদেশ শ্রবণমাত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিতেছেন; ভ্রাতৃগণের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। রামের

এই ভাব দর্শন করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সামান্য কারণে এই গভীর জলধি চঞ্চল হয় নাই; না জানি কি গুরুতর বিপদই উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মলিন-বদনে ব্যাকুল-হৃদয়ে রামচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামচন্দ্র কিছুই বলিতেছেন না দেখিয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠা ক্রমেই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে, বিনীত-বচনে বলিলেন, "দাদা, আজ আপনার এ কি ভাব দেখিতেছি? সামান্য কারণে আপনাকে এতদূর চঞ্চল করিতে পারে না। কি বিষম অনর্থপাত হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া আমাদিগের ভয় ও উৎকণ্ঠা দূর করুন। আপনার এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমরা মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।"

লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেন; তৎপরে অনেক কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, আমি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি। আমাদের অরণ্যবাসকালে দুর্ব্বৃত্ত দশানন পঞ্চবটী বন হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহার পর আমরা রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার করি। এক্ষণে আমার প্রজাবর্গ বলিতেছে যে, সীতাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হয় নাই। যে রমণী পরগৃহে

বাস করিয়াছেন, যে রমণী পরপুরুষ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন, তাঁহাকে এমন ভাবে গৃহে স্থান প্রদান করিয়া আমি নিষ্কলঙ্ক রঘুকুলের সম্মান ও খ্যাতি নষ্ট করিয়াছি, প্রজাগণ এই কথা বলিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ! প্রজারঞ্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি; যাহাতে প্রজাদিগের মনে কোন প্রকার অসন্তোষের উদয় না হয় সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কারণে আমি স্থির করিয়াছি যে সীতাকে পরিত্যাগ করিব। বৎস লক্ষ্মণ, আজই সীতা বনভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমিও তাঁহার বাসনাপূরণে স্বীকৃত হইয়াছি। তুমি আগামী কল্য সীতাকে বনভ্রমণ ব্যপদেশে লইয়া গিয়া কোন তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে।”

রামচন্দ্রের মুখে যে এমন কথা শ্রবণ করিবেন তাহা কেহই স্বপ্নেও ভাবেন নাই; সুতরাং ভ্রাতৃত্রয়ের মস্তকে এই সংবাদ বিনামেঘে বজ্রপাত সদৃশ হইল; তাঁহারা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মণ বলিলেন, “দাদা, আপনার আদেশ আমি কোনদিন লঙ্ঘন করি নাই। কিন্তু আজ এ কি আদেশ করিতেছেন? রাবণ একাকিনী পাইয়া সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল, তাহা জানি। তাহার পর আমরা সেই দুর্ব্বৃত্তের শাস্তিবিধান করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করি। কিন্তু তাহার পর যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? আপনি

লঙ্কাজয়ের পর সীতাদেবীকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি যে অলৌকিক অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা জগদ্‌বাসীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং অগ্নিদেব যে সীতাদেবীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এ কথা কি আপনি ভুলিয়া গেলেন ? তবে আবার এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চান কেন ?”

রামচন্দ্র বলিলেন, “ভাই, সীতা যে নিষ্কলঙ্কচরিত্রা, তাহা কি আমি জানি না ; সে বিষয়ে কি আমার সন্দেহ আছে ? সীতার অগ্নিপরীক্ষা ত অযোধ্যাবাসীদিগের সমক্ষে হয় নাই ; কাজেই তাহারা বিশ্বাস করিবে কেন ? আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রজারঞ্জনের ভার গ্রহণ করিয়াছি ; প্রজার কল্যাণের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি ; এখন কি ভাই আত্মসুখের জন্য সেই কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইব ? তোমরা কি আমাকে এই পরামর্শ দিতে পার ?”

লক্ষ্মণ বলিলেন “আর্য্য, আপনাকে পরামর্শ প্রদান করি এমন সাধ্য আমাদের নাই। তবে আমার বক্তব্য এই যে, লঙ্কায় যে অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা ত গোপনে হয় নাই। সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল। তাহাদের সম্মুখে সীতাদেবী যে অলৌকিক পরীক্ষা প্রদান করিয়া জগতে সতী-মহিমার অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই কি যথেষ্ট নহে ? তাহার পর আর এক কথা ; এই পৃথিবীতে নানা শ্রেণীর লোক বসতি করে ; সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান,

বিবেচনাশক্তি সমান নহে। কতকগুলি লোক আছে, পরনিন্দা, পরকুৎসাই যাহাদের উপজীব্য। তাহারা সত্য-মিথ্যার দিকে দৃষ্টি করে না ; পরের নিন্দা বা কুৎসা প্রচারেই তাহাদের আনন্দ। এই শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করা মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবগণেরও অসাধ্য। কোথায় কে কি কথা বলিল, তাহাই শুনিয়া যদি এ প্রকার বিচলিত হইতে হয়, এবং তাহারই জন্য যদি এমন নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে লোকালয়ে বাস করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর্য্য, ক্ষমা করিবেন ; মনের আবেগে কয়েকটি কথা বলিলাম। আমি চিরদিনই আপনার দাস ; আমাকে যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই পালন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি ; কিন্তু আমি উপায়ান্তর দেখিতেছি না। রাজার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি প্রতিপালন করিব ; সূর্য্যবংশকে কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিতে পারিব না। তুমি আর আপত্তি করিও না ; কল্য প্রভাতেই আমার আদেশ মত কার্য্য করিবে। আর একটী কথা ; আমি যে জানকীকে পরিত্যাগ করিলাম, গঙ্গাপার হইবার পূর্ব্বে একথা তাঁহাকে বলিও না।" এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনতবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রামের চরণ-বন্দনা করিয়া শোকভারাবনত-হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্ব নিদেশ অনুসারে সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি মুনিপত্নীদিগকে দিবার নিমিত্ত বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আদি সজ্জিত করিয়া বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "বৎস, তপোবন-ভ্রমণের আনন্দে আমার গত রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই ; প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত আয়োজন করিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। এত প্রত্যূষে আর্য্যপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না মনে করিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে গত কল্যই বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

তখন সমুদায় দ্রব্য লইয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। তাহার পর যখন রথ অযোধ্যা-নগরী পরিত্যাগ করিয়া বনভূমিতে প্রবেশ করিল, তখন সীতার আর আনন্দের সীমা রহিল না ; তিনি কত সামান্য দ্রব্যের প্রতিও লক্ষ্মণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অতি কষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া সীতার ন্যায় আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণকালে তাঁহারা গোমতী-তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সে রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতকালে তাঁহারা সে স্থান হইতে যাত্রা করিয়া ভাগীরথী-তীরে উপনীত হইলেন। ভাগীরথী পার হইয়াই

সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি আজ দুই দিন বহু কষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগীরথী দর্শন করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। লক্ষ্মণের এই ভাব দর্শন করিয়া সীতাদেবী বলিলেন, "বৎস, সহসা তোমার ভাবান্তর হইল কেন? তুমি এত কাতর হইতেছ কেন?"

লক্ষ্মণ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ভাগীরথী দর্শন করিয়াই আমার এইরূপ ভাব হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি সত্বরই গঙ্গা পারের ব্যবস্থা করিতেছি।" সত্বরই নৌকার ব্যবস্থা হইল। তখন লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথ লইয়া ঐ স্থানে অপেক্ষা করিবার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক সীতার সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন।

নৌকা অপরতীরে সংলগ্ন হইবামাত্রই সীতা অত্যন্ত ব্যগ্রতাসহকারে তীরে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সত্বর বনের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে বলিলেন, "দেবী, এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে।" এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মণ বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন, তিনি আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না, ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন।

লক্ষ্মণের এই ভাব দর্শন করিয়া সীতাদেবী বিশেষ ভীতা হইলেন। না জানি কি অনর্থপাত হইয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইয়া গেল ; তিনি যে কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বসনাঞ্চলে লক্ষ্মণের অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কি হইয়াছে, আমায় বল। তোমার এই ভাব দেখিয়া আমার মনে যে কত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আর বলিয়া উঠিতে পারি না। লক্ষ্মণ, আর বিলম্ব করিও না ; কেন তোমার এমন ভাবান্তর হইল, আমাকে খুলিয়া বল ; আমি আর এমন সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিতেছি না।"

লক্ষ্মণ তখন অতি কষ্টে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন, "দেবি, বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন, সেই কারণে পৌরগণ ও জানপদবর্গ আপনার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকে। আর্য্য তাহা শুনিয়া একেবারে স্নেহ, দয়া ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদমোচনার্থ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ এই যে, আপনাকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেবি, আমরা সেই বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি।"

লক্ষ্মণের মুখে এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া

সীতাদেবী বজ্রাহতপ্রায় হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি বাস্তব জগৎ হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্তা হইয়া পড়িয়াছেন; ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি স্বপ্ন!" পরক্ষণেই অতি কষ্টে মনোভাব সংযত করিয়া করুণ কণ্ঠে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস, কাহারও দোষ নাই। অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। চিরজীবন দুঃখভোগ করিবার জন্যই সীতার জন্ম। নিয়তির সে নির্ম্মম বিধান কে খণ্ডন করিবে? রাজার কন্যা, রাজকুলবধূ হইয়া আমার মত কষ্ট এ পৃথিবীতে আর কে পাইয়াছে? পূর্ব্বজন্মে হয় ত আমি কোন পতিপ্রাণা পত্নীর স্বামিবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, এ জন্মে তাহার ফল-ভোগ করিতেছি। ছিঃ, লক্ষ্মণ! তুমি কাঁদিও না; দুঃখিনী সীতার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা হউক। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আর্য্যপুত্রের নিকট ফিরিয়া যাও। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাতর ও অধীর হইয়াছেন সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার চিত্ত স্থির হয়, বিষণ্ণতা অপসৃত হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হইও। তাঁহাকে কহিও, আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না বা অসন্তুষ্টা নহি। প্রজারঞ্জনই রাজধর্ম্ম, তিনি রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। প্রকৃতিপুঞ্জের পরিতুষ্টির জন্য, তিনি আমাকে সম্পূর্ণ নিপরাধিনী জানিয়াও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি আমাকে অবিশ্বাসিনী স্থির করিয়াছেন, এ কথা আমি স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারিব না। তাঁহার

হৃদয় তেমন সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না। এ বিশ্বাস যেদিন হারাইব, সে দিন আমার সমস্ত নারীধর্ম্ম নরকের অতল তলে নিক্ষিপ্ত হইবে। বৎস লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্রের চরণে আমার একটী কাতর নিবেদন আছে। তুমি তাঁহাকে বলিও, যদিও তিনি লোকাপবাদভয়ে আমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া অভাগী যেন তাঁহার হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত না হয়। তাঁহাকে বলিও স্থানের দূরত্ব, দূরত্ব নহে। ছিঃ, লক্ষ্মণ! অশ্রু সংবরণ কর। আমি শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে, নিদ্রায় তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্না থাকিব। তিনি আমার হৃদয়ের অধীশ্বর, আমি সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া তাঁহার জন্য যে স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি, সেই আসনেই আমি তাঁহাকে অনুক্ষণ অধিষ্ঠিত দেখিব। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি প্রভু, আমি দাসী;—তিনি রাজা, আমি রাণী;—তিনি গুরু, আমি শিষ্যা;—তিনি দেবতা, আমি সাধিকা;—তিনি অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্র, অমি বনবাসিনী রামপ্রিয়া। এ অধিকার হইতে কে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে? গর্ব্বের এ উন্নত শিখর হইতে কে আমাকে বিচ্যুত করিতে পারে? প্রেমের এ স্বর্গ হইতে কে আমাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে? বৎস, মনে পড়ে লঙ্কার সেই অগ্নি-পরীক্ষার কথা—তখন আমি সতীত্বের গর্ব্ব করিয়াছিলাম,—তখন আমি পত্নীত্বের গর্ব্ব করিয়াছিলাম,—তখন আমার সতী-মহিমা আহত হইয়াছিল;

কিন্তু আজ আমার সে দিন নাই—আজ আমি সে সীতা নহি। তখন আমি ছিলাম রমণী—আজ,—আজ আমি জননী। আজ আমি মাতৃত্বের মহোচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা—আজ আমার গর্ভে মহারাজ রামচন্দ্রের সন্তান অবস্থান করিতেছেন। আজ আর আমার পরীক্ষা প্রদানের প্রয়োজন নাই, আজ আর আমার অধিকার-স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। স্বয়ং ভগবান্ আমার অধিকার স্থাপিত করিয়াছেন। বলিও বৎস, আমার নাম করিয়া প্রভুকে বলিও, সসাগরা ধরার অধীশ্বরের রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমি কোথায় যাইব? যাও বৎস, সত্বর যাও। না জানি আর্য্যপুত্র কতই অধীর হইয়াছেন। লক্ষ্মণ, তোমার নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ—ঐ কোমল হৃদয়ে শক্তিশেল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলে। বৎস, তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আর্য্যপুত্রকে কখন একাকী থাকিতে দিবে না, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে; যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে। তিনি সুস্থ আছেন, তিনি কুশলে আছেন, এই সংবাদ লোকমুখে শুনিতে পাইলেই আমি শান্ত থাকিব, আমি বনবাসের সকল কষ্ট সকল দুঃখ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব। যাও, বৎস, আর বিলম্ব করিও না। লক্ষ্মণ! আর একটী কথা—মাতা কেকয়ী, মাতা সুমিত্রা, মাতা কৌসল্যাকে তাঁহাদের দুঃখিনী পুত্রবধূর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইও। তাঁহাদের বলিও,

তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে পতিচরণাশ্রয়বঞ্চিতা, পতিবিরহব্যথিতা, অভাগী সীতা পতিধ্যানে নিমগ্না থাকিয়া এই শ্বাপদসঙ্কুল জনহীন অরণ্যানীকেও সুখাশ্রয় বলিয়া মনে করিতে পারিবে। আর কি বলিব লক্ষ্মণ! আমার প্রিয় ভগিনী ঊর্ম্মিলাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং অপরাপর শুদ্ধান্তবাসিনীগণকে আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাইও, এবং তুমিও আমার সর্ব্বান্তঃ-করণের আশীর্ব্বাদ লইয়া অগ্রজের চিত্তবিনোদনে অনুক্ষণ নিবিষ্ট থাকিও। দেখিও লক্ষ্মণ, আমার এই শেষ অনুরোধ বিস্মৃত হইও না।"

লক্ষ্মণ তখন সীতাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে নৌকায় আরোহণ করিলেন; অল্পক্ষণ পরেই নৌকা ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ দেখা যায়, লক্ষ্মণ সীতাকে দেখিতে লাগিলেন; সীতাও রথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রথ দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেলে, সীতা চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; এতক্ষণ পরে নয়নজলে তাঁহার বসন ভিজিয়া গেল। তিনি সেই পবিত্রসলিলা ভাগীরথী-তীরে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ঋষিকুমারগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া সীতাকে এই অবস্থায় দর্শন করিলেন। দেবীসদৃশা মহিলাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী না

হইয়া তাঁহারা অনতিবিলম্বে মহর্ষি বাল্মীকি-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমরা নদীতীরে এক অলৌকিক রূপবতী মহিলাকে রোদন করিতে দেখিয়া আসিলাম; তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই। আমরা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত মনে করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

ঋষিকুমারদিগের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন; এবং সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসে, আর ক্রন্দন করিও না। আমি তপোবলে তোমার আগমন জানিতে পারিয়াছি। তোমার পরিচয়ও আমার অজ্ঞাত নহে। মনে করিও না, তুমি এখানে নিরাশ্রয়া। তোমাকে আশ্রয় দিবার জন্যই ত আমার এত দিনের সাধনা। এস মা, রঘুকুল-রাজলক্ষ্মি! আমার তপোবন আজ সতীর পদার্পণে পবিত্র হউক। আমার সৌভাগ্য যে, এতদিনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইলাম।"

মহর্ষির কথা শুনিয়া সীতাদেবীর হৃদয় শান্ত হইল। তিনি গললগ্নীকৃতবাসে মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন। বাল্মীকি "রঘুকুলতিলক পুত্র প্রসব কর" এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "বৎসে, আর বিলম্ব করিও না; আমার আশ্রমে চল।" এই বলিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া সীতার সমবয়স্কা মুনিকন্যাদিগের হস্তে তাঁহার সেবার

ভার সমর্পণ করিলেন। মুনিকন্যাগণ সীতার ন্যায় সঙ্গিনী লাভ করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদনে অবহিত হইলেন।

নবম অধ্যায়

কিছুদিন পরে সীতাদেবী দুই যমজ কুমার প্রসব করিলেন। তপোবন-বাসীদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না; সেই তপোবনে সীতার শুশ্রূষার জন্য যাহা করা সম্ভবপর, তাহার ক্রুটী হইল না। মহর্ষি বাল্মীকি যথারীতি জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান শেষ করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। বনবাসিনী সীতাদেবী কুমার-যুগলের বদন দর্শন করিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। এক্ষণে তিনি আর একটী কাজ প্রাপ্ত হইলেন। এতদিন কেবল রামচন্দ্রের ধ্যানেই কালযাপন করিতেন, এক্ষণে রামচন্দ্রের তনয়দ্বয়ের লালন-পালনের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি পুত্রদ্বয়কে পরম যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লবের শিক্ষাভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ঋষিকুমারগণ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া

থাকে, তাহাই শিক্ষা দিলে এই বালকদ্বয়ের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। তাহারা ত আর ঋষিবালক নহে; ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি তাহাদের ভবিষ্যৎও জানিতেন; সুতরাং বালকদ্বয়কে ক্ষত্রিয়ের কুমারগণের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করাই মহর্ষি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। একে বালকদ্বয় মেধাবী, তাহার পর জননীর উপদেশে তাহারা চলিত; তাহার পর এমন একজন ঋষি তাহাদিগের শিক্ষক; সুতরাং বালকদ্বয়ের শিক্ষা-কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত মহর্ষি বাল্মীকির শান্তিরসাস্পদ তপোবনের বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক মহর্ষি কখন বালকদ্বয়কে নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন; কখনও বা বনের মধ্যে লইয়া গিয়া ধনুর্ব্বাণ ও নানা অস্ত্র-ব্যবহার শিক্ষা দিতেন। মহর্ষি ইচ্ছা করিয়াই বালকদ্বয়কে আর একটী বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন; তিনি স্বয়ং সঙ্গীত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন; কুশ ও লবকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন হইতে রামচরিত লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন; কুশ ও লব যখন তাঁহার নিকট শিক্ষা-গ্রহণের উপযুক্ত হইল, তখন তাঁহার রামায়ণ রচনা শেষ হইয়াছে, তিনি কুশ ও লবকে সেই রামায়ণ গান করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকদ্বয় যখন বীণাযন্ত্রসহকারে মহর্ষি-রচিত রামচরিত গান করিত, তখন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া সেই তানলয়বিশুদ্ধ গাথা শ্রবণ করিত। বালকদ্বয়

জানিত না যে, তাহারা তাহাদেরই পরম পূজনীয় পিতৃদেবের জীবনচরিত গান করিতেছে ; তাহারা জানিত সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় নরপতি পৃথিবীতে আর নাই ; সেই রামচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। আর সীতাদেবী,—তিনি যখন পুত্রদ্বয়ের মুখে রাম-চরিত শ্রবণ করিতেন, তখন তাঁহার নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইত, তিনি একমনে পুত্রের মুখে পিতার পবিত্র চরিত-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। এইরূপে বালকদ্বয় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু মহর্ষি এই শিক্ষা প্রদান করিয়াও নিশ্চিন্ত হইলেন না ; যে বালকেরা ভবিষ্যতে অযোধ্যার অধিপতি হইবে, এখন হইতেই তাহাদিগের রাজ্য-শাসন-প্রণালী শিক্ষা করা প্রয়োজন। মহর্ষির তপোবনে অন্য সকল শিক্ষাই হইতে পারে, কিন্তু রাজ্যশাসনশিক্ষা কেমন করিয়া হইবে ? তখন কি উপায়ে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা পুনরায় গৃহীতা হন, মহর্ষি সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

সুযোগ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। একদিন সায়ংকালে একজন লোক মহর্ষির তপোবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদান করিল। মহারাজ রামচন্দ্র অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা তাহারই নিমন্ত্রণ-পত্র। মহর্ষি পত্রবাহককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বিদায়প্রদানপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, ভগবান্ তাহার পথ করিয়া

দিলেন। আমি কুশলবকে সঙ্গে লইয়া এই অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন করিব; তাহারা ঋষিকুমার পরিচয়ে যজ্ঞস্থলে এবং অযোধ্যানগরীর নানা স্থানে রামায়ণ গান করিবে। তাহারা যে প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এবং তাহাদিগের অবয়বের সহিত মহারাজ রামচন্দ্রের অবয়বের যে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, তাহাতে এই বালকদ্বয়ের প্রতি মহারাজের মনোযোগ হইবেই তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই; তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু মা জানকীর বিনা অনুমতিতে তাঁহার কুমারদ্বয়কে অযোধ্যার রাজসভায় লইয়া যাওয়া আমারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সীতার কুটীরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বৎসে, মহারাজ রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছি। তোমার পুত্রদ্বয়কে আমি শিষ্যভাবে সঙ্গে লইতে চাই। তোমার কি ইহাতে কোনও আপত্তি আছে?" সীতাদেবী ধীর ও নম্র স্বরে বলিলেন, "ভগবন্, বালকদ্বয় যদিও আমার গর্ভজাত, যদিও মহারাজ রামচন্দ্রের ঔরসে তাহাদের জন্ম, তবুও আমরা উহাদের কেহই নহি; আপনিই উহাদের যথাসর্ব্বস্ব। বালকদ্বয়ের মঙ্গলের জন্য এক্ষণে আপনি যাহা কহিবেন, তাহার উপর কথা বলিবার লোক জীবিত থাকা সত্ত্বেও, বালকদ্বয় সে অনুগ্রহে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত। অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, সে বিষয়ে

যথেষ্ট উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বালকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। ভগবন্, উহারা কুটীরবাসিনী দুঃখিনী সীতার সন্তান; আপনার স্নেহানুগ্রহে উহারা প্রতিপালিত; মহানগরীর কোন বিষয়ই উহারা অবগত নহে; উহারা যে রাজপুত্র, তাহাও জানে না। এ অবস্থায় যাহাতে উহারা আপনার শিষ্যত্বের অমর্য্যাদা না করে, সেই সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবেন।”

মহর্ষি তখন কুশলবকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক অযোধ্যা-গমন-বার্ত্তা তাহাদিগকে বলিলেন। তাহারা রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে পারিবে এই আনন্দে অধীর হইল। এ দিকে যে লোক নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া আসিয়াছিল, ঋষিকুমারীগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, “যজ্ঞানুষ্ঠানে সস্ত্রীক না হইলে কার্য্যে অধিকার জন্মে না; রামচন্দ্র কি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন ?” সে লোকটী বলিল, “না, তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।” ঋষিকুমারী-দিগের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীর হৃদয়ে অভূত-পূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্ব আবির্ভূত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “ধন্য মহারাজ রামচন্দ্র, আর ধন্য আমি সেই রামচন্দ্রের চিরদুঃখিনী সহধর্ম্মিণী সীতা ! আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল এই সংবাদের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে জাগরিত রাখিয়া পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে পারিব।”

এদিকে বালকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি বাল্মীকি যথা-সময়ে রামচন্দ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঋষিকুমার-বেশী বালকদ্বয় যজ্ঞস্থলে ও অযোধ্যার নানাস্থানে রামচরিত কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বালকদ্বয়ের মুখে যে এই সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিল সেই-ই মোহিত হইল। ক্রমে ক্রমে এই কথা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি পরম সমাদরে বালকদ্বয়কে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। তাহারা রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার বোধ হইল, তাঁহারই বালককালের মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া এই দুই বালক ঋষিকুমার বেশে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি বালক-দিগের দিকে যতই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল, ইহারা জানকী-তনয় না হইয়াই যায় না। তাহার পর বালকদ্বয় যখন সুমধুর কণ্ঠে তাঁহারই গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইল, তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া তিনি বালকদ্বয়কে পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। তখন কুশ ও লব কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রবচনে কহিল "মহারাজ! আমরা কুটীরবাসী ফলমূলাশী;